# নাগরিক উদ্যোগ

একটি মানবাধিকার বিষয়ক প্রকাশনা

নবম বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা
জুলাই - ডিসেম্বর ২০১০

## ঔদ্ধত্যের কাছে মাথা নুইয়ে সমাজ চলতে পারে না

## শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের লাগাম টানা জরুরি

সাক্ষাৎকার : রাশেদা কে. চৌধূরী

## চল্লিশ উত্তর দশকে বিচার ব্যবস্থার স্বপ্ন-নকশা

## গণতন্ত্রের দু'দশকে নারীর অর্জন

# বালক বিয়ে প্রথা শিশু অধিকার প্রসঙ্গ

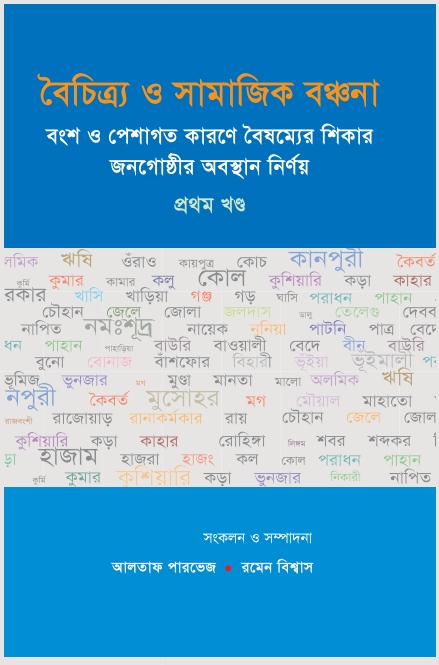


বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকারের স্বীকৃতি থাকলেও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এখনো নানা বৈষম্যের শিকার। এদের মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত হলো দলিত জনগোষ্ঠী। সামগ্রিকভাবে শিক্ষা, সুযোগ ও সম্পত্তিতে অধিকারহীনতার কারণে নিজেদের অধিকার আদায়ে সংঘবদ্ধ হতে পারেনি। বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম) প্রথমবারের মতো এসব বিচ্ছিন্ন বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কাজে নাগরিক উদ্যোগ সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করছে। বিডিইআরএম ‘বৈচিত্র্য ও সামাজিক বঞ্চনা’ শিরোনামে একটি সংকলন প্রকাশ করেছে। এই প্রকাশনায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কিংবা বিভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত দলিতদের ৫৭টি জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

**সংকলন ও সম্পাদনা :** আলতাফ পারভেজ ও রমেন বিশ্বাস

**প্রকাশক :** বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম) এবং নাগরিক উদ্যোগ

**প্রকাশকাল :** আগস্ট ২০১০

**মূল্য :** ১০০ টাকা

ISBN : 978-984-33-1622-6

‘প্রতিবন্ধিত্ব প্রেক্ষিত মানবাধিকার ও সেবার মান উন্নয়ন’ এটি একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ। উক্ত প্রকাশনাটিতে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর বৈশ্বিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশপাশি প্রতিবন্ধিত্বের কারণ নির্ণয়, দেশীয় অবস্থান থেকে তাদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, তাদের প্রতি পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় আচরণ এবং দৃষ্টিভঙিও ফুটে উঠেছে। গবেষণা কাজে আন্তজার্তিকভাবে স্বীকৃত জরিপ পদ্ধতি এবং কেইস স্ট্যাডির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য সন্নিবেশ হয়েছে আলোচিত গ্রন্থটিতে। এছাড়া সংযোজিত হয়েছে বাংলায় প্রকাশিত জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ এবং ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধি-বিধান’। প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছেন বা কাজের আগ্রহ আছে এমন প্রতিষ্ঠান এবং একাডেমিশিয়ানদের জন্য একটি সহায়ক প্রকাশনা।

**গবেষক :** জাকির হোসেন ও ড. আলতাফ হোসেন

**প্রকাশক :** নাগরিক উদ্যোগ

**প্রকাশকাল :** জুন ২০১০

**মূল্য :** ১৫০ টাকা

ISBN : 978-984-33-2058-2

# সূচিপত্র

## বালক বিয়ে প্রথা
## শিশু অধিকার প্রসঙ্গ ৩

শুধু বাংলাদেশেই নয়, উপমহাদেশেও বাল্যবিয়ের চর্চা ব্যাপক। কিন্তু মজার বিষয় হলো– বাল্যবিয়ে নিয়ে প্রচলিত ডিসকোর্সে অধিকাংশ সময় অপ্রাপ্ত বয়সে বালিকার বিয়ে হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করেই ঘটনা প্রবাহিত হয়। আলোচনার কেন্দ্রস্থল থেকে বাইরে থেকে যায় অল্প বয়সে বালকের বিয়ের ঘটনাপ্রবাহটি। গবেষণালব্ধ আলোচ্য নিবন্ধে এবিষয়টিই ওঠিয়ে এনে নতুন ভাবনার সূচনা করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক **ড.ফারজানা ইসলাম** এবং তরুণ গবেষক **মোঃ মোসাব্বের হোসেন**।

## শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের লাগাম টানা জরুরি ১৩

**রাশেদা কে. চৌধূরী** সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা। বর্তমানে তিনি শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে কাজ করছে এমন সহস্রাধিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সমন্বয়ক প্রতিষ্ঠান 'গণসাক্ষরতা অভিযান' এর নির্বাহী পরিচালক। নাগরিক উদ্যোগ বার্তায় তিনি কথা বলেছেন শিক্ষানীতি, শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা-সম্ভাবনা, শিক্ষা আন্দোলনে এনজিওগুলোর সম্পৃক্ততাসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে।

## গণতন্ত্রের দু'দশকে নারীর অর্জন ১০

কোনো দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহী পদ একনাগাড়ে নারীদের দখলে থাকার ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী রেকর্ডটি এখন বাংলাদেশের। শুধু তাই নয়, এ দেশের উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে জড়িয়ে আছে নারীর শ্রম ও কর্মনিষ্ঠা। বাস্তবতার এসিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নারীর প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তির টানাপোড়ন আছে অনেক। তাই নিয়ে লিখেছেন স্বাধীন গবেষক এবং সাংবাদিক **আলতাফ পারভেজ**।

## আরো যা আছে


চলি-শ উত্তর দশকে বিচার ব্যবস্থার স্বপ্ন-নকশা – মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী ০৮
ঔদ্ধত্যের কাছে মাথা নুইয়ে সমাজ চলতে পারে না – ড. হামিদা হোসেন ১৭
উত্ত্যক্তকরণ প্রতিরোধে জনমত গড়ে তোলা জরুরি – ওয়াজিহা রহমান ১৮
সহস্রাব্দ উন্নয়ন অঙ্গীকার: মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিস্থিতি– মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম নয়ন ২০
প্রসঙ্গ সংবিধান সংশোধন: বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠী – আবুল বাসার ২২
নারী মুক্তিযোদ্ধাদের কথামালা – সংকলিত ২৪
আদিবাসীর প্রান্তিকতা: উত্তরবঙ্গের বাস্তবতা – এম এম কবীর মামুন ২৬
বই পর্যালোচনা – মাজহারুল ইসলাম ২৮
নাগরিক উদ্যোগের কার্যক্রম ৩০



নাগরিক উদ্যোগ
একটি মানবাধিকার বিষয়ক প্রকাশনা

**সম্পাদক**
জাকির হোসেন

**সহযোগী সম্পাদক**
সোমা দত্ত

**সম্পাদনা সহযোগী**
ওয়াজিহা রহমান
উম্মে ফাহমিদা সুলতানা

**সম্পাদকমণ্ডলী**
বৃত্বা রায়
অমিত রঞ্জন দে
মাহাবুবা সুলতানা

**প্রচ্ছদ ও অলংকরণ**
মিঠু আহমেদ

**আলোকচিত্র**
নাগরিক উদ্যোগ ও ইন্টারনেট

**প্রকাশক**
নাগরিক উদ্যোগ
বাড়ি : ৮/১৪, ব-ক : বি, লালমাটিয়া
ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৮১১৫৮৬৮,
ফ্যাক্স : ৯১৪১৫১১
ইমেইল : nu@bdmail.net
ওয়েবসাইট : www.nuhr.org

**মুদ্রণ**
চৌধুরী প্রিন্টার্স অ্যান্ড সাপ-াই
৪৮/এ/১, বাড্ডা নগর লেন
পিলখানা, ঢাকা-১২০৫

**দাম** : ১৫ টাকা

# সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

## সামাজিক নিরাপত্তা ও খাদ্যের অধিকার

সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা অপরিহার্য শর্ত। শুধু বাংলাদেশে নয় সারা বিশ্বে এ মুহূর্তে খাদ্য নিরাপত্তা সর্বাধিক আলোচিত একটি বিষয়। এটি অর্জিত হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং সময় ও অঞ্চলভেদে সরবরাহে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। যাতে প্রত্যেক মানুষের খাদ্য সংগ্রহের সুযোগ এবং পরিবারের সব সদস্যের পুষ্টি চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের নিশ্চয়তা থাকে। এটা ঠিক, বিশ্বব্যাপী নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে গম ও চালের মূল্য বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশেও পুরো বছর জুড়েই খাদ্যমূল্য অস্থিতিশীল ছিল। বাংলাদেশসহ এশিয়ার ১৯টি দেশ খাদ্যমূল্য ঠেকাতে ইতিমধ্যে কিছু কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন– খোলা বাজারে কম মূল্যে চাল বিক্রি, খাদ্যশস্য রফতানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও মূল্য বৃদ্ধি, আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার, চাল ক্রয়ের জন্য বিনাসুদে ঋণ প্রদান, ধান চাল ক্রয়ে সরকারের মূল্য বৃদ্ধি, সার ও ডিজেল ক্রয়ে ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি। কিন্তু স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য এখনো এ উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। এখনো তাদের আয়ের বেশির ভাগ খরচ হয় খাদ্যদ্রব্য– বিশেষত চাল, আটা, আলু, ভোজ্যতেল ইত্যাদি কিনতে। পুষ্টিকর খাবারগুলো অনেকেরই আয়ত্ত্বের বাইরে। এ জন্য দরকার অধিকার ভিত্তিক খাদ্যনীতি প্রণয়ন করা, যার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত সম্ভব হবে।

সরকার সাধারণ মানুষের খাদ্য নিশ্চিত করার পদক্ষেপ হিসেবে ওএমএস চালু করেছে। প্রতিদিন দীর্ঘ হচ্ছে ওএমএস- এর ট্রাকের সামনে অনাহারি-অর্ধাহারি মানুষের লাইন। অনেকেই ভোর থেকে অন্যান্য কাজ ফেলে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন একটু কম মূল্যে চাল কেনার আশায়। তবে তাদের সবার অভিমত, এভাবে লাইনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে যে পরিমাণ চাল সংগ্রহ করা যায় তাতে দুই দিন দুবেলা পেটভরে খাওয়ার সংস্থান হয় না। তাদের দাবি– সরকারিভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার। তারা এটাও বলেন, আমরা রোজগার করে চলতে চাই। সরকার আমাদের প্রত্যেকের কাজের ব্যবস্থা করে দিক। তাই দীর্ঘ মেয়াদে দান-খয়রাতি ব্যবস্থার পরিবর্তে কী করে কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়, তার একটি উপায় বের করার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। এ জন্য অপ্রতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নীতি গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি। ▣

*প্রিয় পাঠক, নাগরিক উদ্যোগ বার্তা এখন থেকে 'নাগরিক উদ্যোগ' নামে নিয়মিত প্রকাশিত হবে। আশা করি আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।*

# বালক বিয়ে প্রথা
# শিশু অধিকার প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের পাশাপাশি উপমহাদেশে বাল্যবিয়েকে ঘিরে যেসব প্রকাশিত প্রকাশনা আছে তা থেকে বাল্যবিয়ের অস্তিত্ব ও ব্যাপকতা স্পষ্ট। মূলত বাল্যবিয়ে বলতে ১৮ বছরের কম বয়সে মেয়েদের বিয়েকে বোঝানো হয়, কিন্তু এ প্রত্যয়টি ছেলেদের ২১ বছর বয়সের নিচের বিয়েকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এ বিষয়টি এখনো একাডেমিশিয়ান, গবেষক, লেখকদের দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে। এ কথা অনস্বীকার্য, বাল্যবিয়ে বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়, যদি মেয়েদের পাশাপাশি বালক বিয়ে প্রথা বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে অনুসন্ধান করা না হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান প্রবন্ধের লেখকদ্বয় বাংলাদেশের একটি গ্রামে নৃবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ করে।[১] সিরাজগঞ্জের জানপুর গ্রামে যথেচ্ছ নমুনায়ন (Random Sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করে পঞ্চাশটি পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাদের মধ্য থেকে দশজন বিবাহিত বালকের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তথ্যদাতাদের বয়সসীমা ছিল ১৩ থেকে ১৮ বছর। বেশির ভাগ তথ্যদাতার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হবার কারণে তাদেরকে কায়িক পরিশ্রমসাধ্য পেশার সাথে যুক্ত হতে দেখা যায়। অধিকাংশ তথ্যদাতাই প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। গবেষণায় দেখা গেছে, পারিবারিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কারণে অনেক ক্ষেত্রেই ছেলে শিশুদের তাদের শৈশব বিসর্জন দিতে হচ্ছে, অপরিপক্ব কাঁধে বইতে হচ্ছে সংসারের গুরুদায়িত্ব। বালক বিয়ের এপ্রলক্ষণ নি:সন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ দাবি করে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে এ গবেষণার আলোকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বালক বিয়ের কারণগুলো এবং বিয়ে পরবর্তী অভিজ্ঞতা ও মতামত নিয়ে আলোচনা উপস্থাপিত হলো–

## অপরিণত বয়সে ছেলেদের বিয়ের কারণ

বিভিন্ন গবেষণা প্রকাশনা পর্যালোচনা করলে সমসাময়িক কালে বাল্যবিয়ে চর্চার পেছনে নানাবিধ কারণ দেখা যায়। দারিদ্র্য, নারীর নিরাপত্তা ও পবিত্রতার বোধ, পরিবারের সম্মান, জটিল সমাজ ব্যবস্থার মাঝে টিকে থাকা এবিষয়গুলোকে বাল্যবিয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[২] সমাজের প্রচলিত ডিসকোর্সে সাধারণত অশিক্ষা, দরিদ্রতা ও পশ্চাৎপদতাকে বাল্যবিয়ের কারণ হিসেবে দেখা হয়। পারিবারিক প্রয়োজন, নির্দেশ, সামাজিক চাপ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় এক্ষেত্রে কাজ করে। এগবেষণায় দেখা গেছে, অভিভাবকের মতামতের ওপর ভিত্তি করে বালক বিবাহের দুটি ধরন লক্ষ্য করা যায়, কেউ বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের মতকে প্রাধাণ্য দেয় আবার বিপরীতে কেউ কেউ নিজের পছন্দে বিয়ে করে। তবে, অভিভাবকের মতেই হোক আর অমতেই হোক, বালক বিয়ে চর্চার পেছনে সাধারণত নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের প্রভাব কাজ করে।[৩] নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে এগবেষণার ভিত্তিতে বালক বিয়ের কারণগুলো আলোচনা করা হলো–

## ক. দারিদ্র্য থেকে মুক্তি ও পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষার কৌশল

পুরুষের বাল্যবিয়ের একটি মূল পরিপ্রেক্ষিত হলো দারিদ্র্য। গবেষণায় দেখা যায়, পরিবারের টিকে থাকা যখন ঝুঁকির মুখে পড়ে, দরিদ্রতা থেকে পরিত্রাণের অন্য কোনো পথ দেখা যায় না তখন টিকে থাকার শেষ কৌশল হিসেবে অভিভাবকরা সন্তানের বয়সের কথা বিবেচনা না করেই বাল্যবিয়ে দিয়ে দেয়। এপ্রসঙ্গে তথ্যদাতা সাইফুলের জীবন অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো–

*'দুই বছর আগে সাবিনার সাথে সাইফুলের বিয়ে হয়। সাইফুলের তুলনায় বয়সে সাবিনা একটু বড়। বিয়ের সময় সাইফুলের বয়স ছিল ১৩ বছর আর তার স্ত্রী সাবিনার বয়স ছিল ১৪ বছর। পরিবারের সুবিধার জন্য অভিভাবকের কথায় সে তার বড় বোনের*

[১] নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৭ সালের স্নাতক পর্যায়ের ৪০৭ নম্বর কোর্সের আওতায় দারিদ্র্য, অসহায়ত্বকে বোঝার জন্য বিশেষত পুরুষপ্রধান সমাজে লিঙ্গীয় অবস্থার সার্বিক অনুধাবনের লক্ষ্যে "পুরুষের বাল্যবিবাহের প্রবাহমানতা : সিরাজগঞ্জের প্রেক্ষিতে অনুধাবন" শিরোনামে গবেষণাটি পরিচালনা করেন মোঃ মোসাব্বের হোসেন এবং এটিকে সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধায়ন করেন ড. ফারজানা ইসলাম। এগবেষণা তথ্যের কারণে মেয়েদের বাল্যবিয়ের পাশাপাশি ছেলেদের বালক বিয়ের প্রলক্ষণটি আমাদের আলোড়িত করতে থাকে। আমরা অনুভব করি এ বিষয়ে গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ দাবি করে।

[২] UNFPA (2005), Child Marriage Factsheet

[৩] ফারজানা ইসলাস তার গবেষণা কাজে নারীদের বাল্যবিয়ের পেছনেও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, দারিদ্রতা– এ বিষয়গুলোর বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেন। বিস্তারিত দেখুন, Islam F.( 2001). 'Women, Employment and the Family:'

*ননদকে বিয়ে করেছে। মায়ের অসুস্থতার কারণে পরিবারের সব কাজ সাধারণত তার বড় বোন সুফিয়া করত। কিন্তু সুফিয়া হঠাৎ ভালবেসে নিজের সিদ্ধান্তে প্রতিবেশী মিজানকে বিয়ে করে ফেলে। বিয়ের সময় সুফিয়ার বয়স ছিল ১৫ বছর। সুফিয়ার বিয়ে হয়ে যাওয়ার কারণে পরিবারে সমস্যা দেখা দেয়। কারণ গৃহস্থালির কাজ করার উপযোগী আর কেউ তাদের বাসায় রইলো না। তাই তার বাবা-মা সাইফুলকে বিয়ে দেয়। সুফিয়া তার ননদের নাম প্রস্তাব দেন। সুফিয়ার স্বামী মিজানেরও এবিয়ের ব্যাপারে আগ্রহ ছিল। সাইফুলের পিতামাতা মিজানদের বাড়িতে বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব দেয়। মিজানের ১৪ বছর বয়সী একটি বোন রয়েছে। মিজানের বাবা-মা আশা করেছিলেন মিজানকে বিয়ে দিয়ে যৌতুক হিসেবে কিছু অর্থ নেবেন। সেই অর্থ দিয়ে সাবিনাকে বিয়ে দেবেন। কিন্তু মিজানের আকস্মিক বিয়ের জন্য তাদের পরিকল্পনাকে ভেঙ্গে যায়, সাবিনাকে বিয়ে দেয়ার দুশ্চিন্তা তৈরি হয়। এ পরিস্থিতিতে মিজানের পরিবার আগ্রহের সাথে তাদের মেয়েকে সাইফুলের হাতে তুলে দেয়। সাইফুলও পরিবারের সুবিধার কথা চিন্তা করে বিয়ে করতে বাধ্য হয়।'*

বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী মনে করা হয় গৃহস্থালিতে কাজ করতে পারবে কেবল মেয়েরা, এজায়গায় শুধু তাকেই মানায়। যেহেতু সাইফুলের মা গৃহকর্ম নিয়মিত করতে পারে না, তাই তাদের গৃহস্থালীকে টিকিয়ে রাখার জন্য সেখানে একজন নারী শ্রমিক আবশ্যক ছিল। তারা দরিদ্র বিধায় এসমস্যা থেকে মুক্তির জন্য কোনো গৃহকর্মী নিয়োগ দিতে পারেনি। যেহেতু সাইফুল ছিল তাদের পরিবারের বড় সন্তান, তাই তার অভিভাবকরা তার বিয়ে দিয়ে পুত্রবধূ আনা ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তা খুঁজে পাননি। বিষয়টা এতোই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, প্রথা অনুযায়ী মেয়ের বয়সের দিকেও তারা নজর দেননি।[৪] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, পরিবার টিকিয়ে রাখার কৌশল হিসেবেই সাইফুল বিয়ে করেছে। এবিয়ের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব মতামত বা সম্মতির তুলনায় পরিবারের চাহিদার বিষয়টিই বেশি প্রাধাণ্য পেয়েছে।

### খ. সন্তানকে ঘিরে বাবা-মার ভবিষ্যৎ

*বাল্যবিয়ে বলতে মূলত নারীর বাল্যবিয়ের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে পাঠ করা হয়। কিন্তু পুরুষের বাল্যবিয়ে নিয়ে তেমন কোনো কথা বলা হচ্ছে না। বাল্যবিয়ের ফলাফল নারীদের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বিশেষত স্বাস্থ্য ঝুঁকির দিক থেকে। তবে অল্প বয়সে বিয়ে পুরুষের জন্যও জটিল জীবন বয়ে নিয়ে আসে।*

#### নিরাপত্তার ভাবনা

ছেলে সন্তানকে অল্প বয়সে বিয়ে দেবার পেছনে সন্তানের প্রতিষ্ঠা ও নিরাপদ ভবিষ্যতের চিন্তা কাজ করে। গবেষণায় দেখা যায়, ছেলেরা যখন লেখাপড়া ছেড়ে দেয় অথবা বখে যায় তখন অভিভাবকরা সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেন। ছেলেদের অল্প বয়সে করা অপরাধকে সাধারণত ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতেই দেখা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলেমানুষি বলে বিষয়টিকে হালকা করার চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে মূলত তাদের তেমন কোনো শাস্তির মুখোমুখী হতে হয় না। এ ধরনের অপরাধের মাত্রা যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন ছেলেকে শোধরানোর কৌশল হিসেবে অনেক ক্ষেত্রেই তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। ধারণা করা হয়, বউ এলে ছেলে ভালো ও সংসারী হয়ে যাবে। তবে এধরনের চিন্তার বাস্তব ফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আশানুরূপ হয় না। তথ্যদাতা রুমনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বিয়ের পরও তার কার্যক্রম পরিবর্তিত হয়নি। বর্তমানেও এলাকায় আগের মতোই তার কুপরিচিতি আছে। আগে যেভাবে চলতো এখনো সে সেভাবেই চলছে। তবে সবসময়ই যে ফল খারাপ হয় এমন নয়। কিছু ক্ষেত্রে ছেলেদের বাবা-মার প্রত্যাশিত পথে চলার নজিরও দেখা যায়।

*'গৌতম অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর আর লেখাপড়া করেনি। সে পড়ালেখা না করে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে সময় ব্যয় করত। তার বাবা তাকে দোকানে বসতে বলেন, কিন্তু গৌতম তখন দোকানে বসতে রাজি হয়নি। পরে তার বাবা-মা তাকে বিয়ে দিয়ে দেন। বর্তমানে সে তার বাবার সাথে তাদের নিজস্ব স্বর্ণের দোকানে কাজ করে। আগে সে এখানে বসতে চাইতো না। কিন্তু বিয়ের পর নিয়মিত দোকানে এসে বসে। তার ভাষায়– 'লেখাপড়া করতে ভালো লাগতো না, এদিক-ওদিক ঘুরতাম তাই বাবা বিয়ে দিয়ে দিলেন। এখন বাধ্য হয়ে কাজ করতে হয়।'*

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সন্তানের ভালো করার প্রত্যাশা থেকে অনেক সময় বাব-মা তাদের অল্প বয়সে বিয়ে দেয়ার কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

### গ. সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ

বালক বিয়ের পেছনে সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত প্রথা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণভাবে কাজ করে। বেশির ভাগ তথ্যদাতাই এর পেছনে সামাজিক বাধ্যবাধকতাকে দায়ী করেন। সামাজিক প্রচলন ও ধর্মীয় প্রথার কারণে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের পাশ্চাত্যের তুলনায় কম বয়সে বিয়ে দেয়া হয়। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ছেলেমেয়েদের গড় বিয়ের বয়স অনেক কম।[৫] এপ্রবণতার পেছনে বিভিন্ন বিষয় কাজ করে। যেমন– পারিবারিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামাজিক প্রচলন। গবেষণায় এক তথ্যদাতার ক্ষেত্রে দেখা গেছে জন্মের আগেই তার বিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ চর্চাটির প্রচলন অবশ্য সমাজের মাঝে খুব বেশি একটা দেখা যায় না। বালক বিয়ের পেছনে ধর্মীয় বোধের গুরুত্ব আছে। ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী ছেলেমেয়েকে দ্রুত বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তাগিদ দেয়া হয়। ইসলাম ধর্ম মতে মনে করা হয়, ছেলেমেয়ে সাবালক হলে তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়া উচিত। তবে সাবালক বলতে নির্দিষ্ট করে কোনো বয়সকে বোঝানো হয় না। সমাজের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ছেলেমেয়েরা যখন নিজের সম্পর্কে বুঝতে শেখে তখনই তাদের বিয়ে দেয়া উচিত মনে করা হয়। গবেষণা এলাকার মসজিদের ইমাম হারুন মুন্সির বক্তব্য অনুযায়ী মুসলমান ধর্ম মতে ২৫ বছর হওয়ার আগেই ছেলেকে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। যদি তা না দেয়া হয় আর কোনো কারণে ছেলেটি

[৪] সাধারণত আমাদের সমাজের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ছেলের তুলনায় বয়সে ছোট মেয়েকে বাছাই করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সাইফুলের বয়স তার স্ত্রী অপেক্ষা কম ছিল।

[৫] UNICEF(2005), Early Marriage Child Spouse.

অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায় তবে সে যত ভালো কাজই করুক বেহেশতে যেতে পারবে না। তাই অল্প বয়সেই ছেলেদের বিয়ে করা ভালো।

### ঘ. নারী-পুরুষের ঘনিষ্ঠতার আতঙ্ক

গবেষণায় দেখা গেছে, বালক বিয়ের একটি বড় কারণ হলো নারী-পুরুষের ঘনিষ্ঠতার আতঙ্ক। বাংলাদেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারী ও পুরুষের ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ককে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখা হয় না। অধিকাংশ অভিভাবকই সাধারণত এ ধরনের সম্পর্ক অনুমোদন করেন না। ছেলেদের ক্ষেত্রে তেমন কঠোর কোনো সিদ্ধান্ত না নিলেও মেয়েদের এধরনের কোনো সম্পর্কের কথা জানলে অভিভাবকরা দ্রুত তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। মেয়ের বাবা-মাও সাধারণত সমবয়সী কোনো ছেলের হাতে তার মেয়েকে তুলে দেয়ার জন্য সম্মত থাকেন না, একই ভাবে ছেলের বাবা-মাও সম্মত থাকেন না। এ কারণে পছন্দের মানুষকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে গোপনে নিজে বিয়ে করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প রাস্তা থাকে না। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের বিয়ে অভিভাবকদের অমতেই সংগঠিত হয়। রাসেল নামে এক তথ্যদাতা এ পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়ে নিজে বিয়ে করেছে। বিয়ের কারণ সম্পর্কে রাসেলের বক্তব্য হচ্ছে, এছাড়া তার সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না। কেননা মেয়েটির বাবা-মা তার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিলেন। মেয়েটি অবশ্য রাসেলকে তার বাবা-মাকে জানিয়ে বিয়ে করার কথা বলেছিল কিন্তু রাসেল তাতে রাজি হয়নি। এর কারণ হিসাবে সে বলে, তার মনে হয়েছিল, বাবা-মাকে জানালেও তারা তাদের বিয়ের ব্যাপারে সম্মতি দেবেন না। এব্যাপারে নানা কথা বলবেন, যেকথা শুনে তার ইচ্ছা পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। ফলে সে বাবা-মাকে না জানিয়ে বিয়ে করেছে।

## ৩. বাল্যবিয়ে পরবর্তী অভিজ্ঞতা ও মতামত মূল্যায়ন

গবেষণায় দেখা যায়, বালক বিয়ের অভিজ্ঞতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুখকর নয়, এটি সাধারণত একজন বালককে নানা ধরনের ঝুঁকির মাঝে ঠেলে দেয়। যেমন– অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, শারীরিক। বাংলাদেশে বিয়ের পর সাধারণত ছেলেকেই সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে হয়। সংসারের চাহিদা পূরণের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পরিপূর্ণভাবে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের আগেই পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে হয়। এ কারণে দেখা যায়, অধিকাংশ বিবাহিত বালকরাই ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী, তাদের স্বাস্থ্য সমস্যার সাথে অর্থনৈতিক ঝুঁকিও যুক্ত হয়ে যায়। কারণ অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা আর কাজ করতে পারে না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহস্থালি চাপের সম্মুখীন হয়। তাদের অনাহারে-অর্ধাহারে থাকতে হয়। যার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব অসুস্থ বালকটির ওপর পড়ে। তাকে সর্বদাই মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এগবেষণার বেশির ভাগ তথ্যদাতাকেই এ ধরনের জীবন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে দেখা গেছে। এ প্রসঙ্গে তথ্যদাতা হান্নানের বক্তব্য হলো–

*'বাল্যবিয়ের কারণে আমি স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারি না। আমাকে সর্বদাই পরিবার, সংসার নিয়ে চিন্তা করতে হয়, এছাড়াও পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করতে হয়। এ কারণে আমি পড়ালেখা করতে পারিনি।"*

হান্নানের অভিজ্ঞতা হতে বলা যায়, ছেলে - মেয়েদের লেখাপড়া না করার একটি কারণ হলো বাল্যবিয়ে। বাল্যবিয়ের ফলে যে দায়িত্বের চাপ একজন বালকের ঘাড়ে এসে পড়ে তার পাশাপাশি পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া সত্যিই অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। হান্নানের মতে, বাল্যবিয়ে তরুণদের মানসিক ও শারীরিক উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা তৈরি করে। হান্নান তার জীবন অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অনুশোচনা প্রকাশ করে বলে, বিয়ে তার স্বাধীনতা হরণ করেছে। তার স্বাভাবিক জীবনযাপন প্রক্রিয়ার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, সে তার ইচ্ছা মতো আর যেখানে সেখানে ঘুরতে পারে না, অন্যত্র কাজে যেতে পারে না, বেড়াতে যেতে পারে না। কারণ এগুলো করতে গেলে তার স্ত্রী বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাকে সন্দেহ করে। সে দুঃখ প্রকাশ করে আরো বলে, পারিবারিক কারণে সে কোনো সঞ্চয় করতে পারে না। বিয়ের কারণে তার উপার্জিত সব অর্থই সংসারের কাজে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। বিয়ে না করলে সে এখান থেকে কিছু সঞ্চয় করতে পারতো ও তা দিয়ে কোনো সম্পদ বানাতে পারতো। তাই বাল্যবিয়ের জন্য যে ধরনের মনস্তাত্ত্বিক, শারীরিক, অর্থনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তারুণ্য বিশেষত কৈশোর বিসর্জন দিতে হয়েছে।

তথ্যদাতা রাসেল একটি মেয়েকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। বিয়ের পরবর্তী জীবনে তার অভিজ্ঞতাও সুখকর হয়নি। তার স্ত্রী তাকে ফেলে রেখে চলে গেছে। রাসেলের মতে অল্প বয়সে অনেকটা ঝোঁকের বশে সে বিয়ে করেছিল, বিয়ের আগে মেয়েটিকে বুঝতে পারেনি, হয়তো এ কারণেই তাদের বনিবনা হয়নি। মেয়েটি তাকে ছেড়ে চলে গেছে। রাসেলের আত্মোউপলব্ধি হলো, বাল্য বয়সে তার বিয়ের সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল। এ কারণে সে আর নিজের পছন্দের বিয়ের প্রতি আগ্রহী নয়। হান্নান ও রাসেলের মতো প্রায় সব তথ্যদাতার বয়ানেই দেখা গেছে বাল্যবিয়ে তাদের জীবনে জটিলতা বয়ে এনেছে। যদিও তাদের একটি স্বাধীন ও সুন্দর কৈশোর অতিক্রম করার অধিকার ছিল।

## ৪. শিশু অধিকার প্রসঙ্গ

শিশু অধিকার সংক্রান্ত আইনগত দৃষ্টিকোণ (সিআরসি) অনুযায়ী, শিশুদের অল্প বয়সে বিয়ে হলে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, বিশেষত শিশু অধিকার। বাংলাদেশ শিশু অধিকার সনদ আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে চললেও এখানকার আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক এবং পারিপার্শ্বিক পশ্চাৎপদতার কারণে আধুনিক সভ্যতা ও উন্নয়নের যুগে এসেও এ দেশে এখনো অগনিত শিশুকে বাল্যবিয়ে প্রথার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। থেরেসা ব-সে (১৯৯৬) তার 'Lost innocence, Stolen childhoods'– এ প্রসঙ্গে বলেন; বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষই নিজেকে একটা রাষ্ট্রের নাগরিকের বদলে সমাজের সদস্য মনে করে। এ কারণে সমাজের যে মতাদর্শ, রীতিনীতি প্রচলিত সে অনুযায়ী আচরণ করে এবং জীবনযাপন করে (Blanchet;১৯৯৬)। বাল্যবিয়ের ক্ষেত্রেও বিষয়টি দেখা যায়। তবে ব-সের লেখায় শিশু শ্রমের ঝুঁকির বিষয়টি যতোটা গুরুত্ব পেয়েছে, বাল্যবিয়ে বিশেষত বালক বিয়ের ঝুঁকির বিষয়টি ততটাই উপেক্ষিত থেকেছে। এ গবেষণায় দেখা গেছে বালক বিয়ে ছেলেদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার মাঝে টেনে নিয়ে যায়। পারিবারিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কারণে অনেক ক্ষেত্রেই ছেলে শিশুদের শৈশব বিসর্জন দিতে হচ্ছে, অপরিপক্ব কাঁধে বইতে হচ্ছে সংসারের গুরুদায়িত্ব, যা সম্পূর্ণভাবে জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদ পরিপন্থী। বালক বিয়ের এপ্রলক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ দাবি করে। বাংলাদেশের বাল্যবিয়ে বিষয়ক গবেষণা কাজগুলোতে এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে এবিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি।

## ৫. বাল্যবিয়ে বিষয়ক গবেষণায় বালক বিয়ে প্রসঙ্গের অনুপস্থিতি

ইউনিসেফের দলিল অনুসারে আমাদের সমাজে বাল্যবিয়ে হচ্ছে অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি চর্চা।[৬] মানবাধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ-এ বাল্যবিয়ে নারীর জন্য অধিক ক্ষতিকর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বিয়ের বয়স, বিয়ের ব্যাপারে সম্মতি, বিয়ের ক্ষেত্রে সমতা, মানুষের ব্যক্তিগত ও সম্পদ অধিকার প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট অন্তর্ভুক্তি রয়েছে।[৭] সমসাময়িক সময়ে বাংলাদেশের সাহিত্য, উন্নয়ন ডিসকোর্স, রাষ্ট্রনীতি সবক্ষেত্রেই মেয়েদের বাল্যবিয়েকে গুরুত্বের সাথে নেয়া হচ্ছে এবং এটিকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে বালক বিয়ের প্রসঙ্গটি। ইউনিসেফ বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে সংক্রান্ত গবেষণার ভিত্তিতে প্রকাশ করে `Early marriage: child spouses.'(2001) প্রতিবেদনটি। এ প্রতিবেদনে বাল্যবিয়ের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। এতে আমাদের সমাজে বাল্যবিয়ে নিয়ে প্রচলিত নানাবিধ সনাতন চর্চার কথা উলে-খ করা হয়েছে। এপ্রতিবেদনটিতে বাল্যবিয়ের মতাদর্শিক কারণের পাশাপাশি আর্থসামাজিক কারণকেও গুরুত্ব দেয়া হয়। এখানে বাল্যবিয়ের কারণ হিসেবে দারিদ্র্যতাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উলে-খ করা হয়েছে। ইউনিসেফের এপ্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় বাল্যবিয়ে রোধের জন্য এবিষয়টি নিয়ে বিস্তর গবেষণা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে তারা গবেষণার বিষয় হিসেবে কিছু ক্ষেত্রের কথা বলেন। এগুলো হলো সামাজিক-অর্থনৈতিক নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে গবেষণা, বিশেষত যে বিষয়টি বাল্যবিয়ের ক্ষেত্রে বেশি প্রভাব রাখে তা নিয়ে গবেষণা। অর্থাৎ বাল্যবিয়ের প্রভাব মূল্যায়ন, ব্যক্তির ওপর বাল্যবিয়ের মানসিক প্রভাব, পরিবার ও সমাজের ওপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বোঝা জরুরি।

Early marriage and childbearing in rural Bangladesh[৮] প্রতিবেদনটিতে গবেষকরা নারীর বাল্যবিয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এখানে দেখা যায়, বাল্যবিয়ের ক্ষেত্রে সমাজে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ। এগবেষণাকর্ম অনুসারে বর্তমানে বাল্যবিয়ে সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। তারপরও আমাদের সমাজে বাল্যবিয়ে দেখা যাচ্ছে। গবেষকরা মনে করেন, আমাদের সমাজে বাল্যবিয়ে রোধের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চার ফাঁক পূরণ করতে হবে। এর জন্য তারা কিছু কৌশল ব্যবহারের কথা বলেন। এগুলো হলো অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মাঝে দেরি করে বিয়ে ও দেরিতে সন্তান গ্রহণের উপকারিতা প্রসঙ্গে প্রচার চালানো উচিত। এছাড়া যেসকল বিষয় বাল্যবিয়ে ত্বরান্বিত করে তার বিরুদ্ধে দরিদ্র পরিবারগুলোকে সচেতন করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। কিন্তু তারা বালক বিয়ের বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে আসেননি। বাংলাদেশের সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে বাল্যবিয়ে বিষয়ক সব প্রকাশনার ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নারীর বাল্যবিয়ের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে কিন্তু পুরুষের বাল্যবিয়ে তেমন গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না, উপরে বর্ণিত বাল্যবিয়ে সংক্রান্ত প্রকাশনাগুলোর ক্ষেত্রেও আমরা এবিষয়টির প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। তাই বাল্যবিয়ে বিষয়টি বিস্তৃতভাবে পুনর্পঠনের দাবি রাখে, কেননা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনো বালক বিয়ের নজির দেখা যায়।

*বালক বিয়ে ছেলেদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার মাঝে টেনে নিয়ে যায়। পারিবারিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কারণে অনেক ক্ষেত্রেই ছেলে শিশুদের শৈশব বিসর্জন দিতে হচ্ছে, অপরিপক্ব কাঁধে বইতে হচ্ছে সংসারের গুরুদায়িত্ব, যা সম্পূর্ণভাবে জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদ পরিপন্থী। সেজন্য বালক বিয়ের এ প্রলক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ দাবি করে। কিন্তু সমসাময়িক সময়ে বাংলাদেশের সাহিত্য, উন্নয়ন ডিসকোর্স, রাষ্ট্রনীতি সবক্ষেত্রেই মেয়েদের বাল্যবিয়েকে গুরুত্বের সাথে নেয়া হচ্ছে এবং এটিকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে বালক বিয়ের প্রসঙ্গটি।*

[৬] UNICEF(2005), Early Marriage, a Harmful Traditional Practice. Statistical exploration.

[৭] IPPF and the Forum on Marriage and the Rights of Women and Girls. Ending Child Marriage, A Guide for Global Policy Action, 2006.

[৮] গবেষকদের (Sidney Ruth Schuler, Farzana Islam, MD Khairul Islam, Lisa M. Bates, ও Geeta Nanda ) দীর্ঘ সময়ব্যাপী মাঠ-ভিত্তিক গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে রচিত গবেষণা প্রতিবেদন।

## ৬. বাল্যবিয়ের ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের পরিপ্রেক্ষিত অনুসন্ধান অনিবার্য

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত প্রেক্ষাপটের সাথে বালক বিয়ের কী সম্পর্ক তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রায় সমবয়সী বিয়ে লিঙ্গীয় সম্পর্কে কী প্রভাব ফেলছে তা দেখা জরুরি। আলোচিত পর্যবেক্ষণ গবেষকদ্বয়কে এবিশে-ষণে আসতে সাহায্য করেছে।

অপরিণত মেয়ের পাশাপাশি বালকের জীবন অধ্যয়ন বাল্যবিয়ে প্রশ্নে নতুন মাত্রা যোগ করবে। বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে বিষয়ক গবেষণাকে গবেষকরা নারীর প্রতি কেন্দ্রীভূত করে ফেলেছে। এ কারণে লিঙ্গীয় সম্পর্ক অধ্যয়ন পরিপূর্ণতা পাচ্ছে না। এ লেখাটি প্রাথমিকভাবে লিঙ্গীয় সম্পর্ক অধ্যয়নে নতুন দিকনির্দেশনা দেবে। ▣

- **মোঃ মোসাব্বের হোসেন** : গবেষণা সহযোগী, ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ

- **ড. ফারজানা ইসলাম** : অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

## তথ্যসূত্র

**Adhikari, R. K. (2003).** *"Early marriage and childbearing: Risks and consequences."* Towards Adulthood: Exploring the Sexual and Reproductive Health of Adolescents in South Asia. Geneva: World Health Organization.

**Ahmed, R. and Nahar M. S. (1987)** *"Brides and Demand System in Bangladesh."* Centre for Social Studies, Dhaka.

**Althusser, Louis (1971),** "*Ideology and Ideological State Apparatuses*" Lenin and Philosophy and Other Essays, Monthly Review Press ISBN 1583670394

**Bangladesh Statistical Yearbook, (2007)**:670, *Bangladesh Bureau of Statistic, Report of Bangladesh.*

**Bloch.S.Maurice(1983),** Marxism and Anthropology, Oxford: Oxford University Press.

**Clifford, James and George Marcus eds(1986),**Writing Culture: The poetics and politics of Ethnography. London:University of California Press.

**Durkheim, E.(1982).** *The Rules of Sociological Method.* London. The Macmillan Press Ltd.

**El-Hamamsy, Laila Shukry (1994),** *"Early Marriage and Reproductionin Two Egyptian Villages"*, The Population Council/UNFPA, New York.

**Ember, carol R. and Melvin Emher(1990),** Cultural Anthropology.6th ed ,New Jersey: Prentice Hall

**Engels, Friedrich(1972),** The Origin of the Family, Private Property, and State. New York: International Publishers

**Evans-Pritchard, E.E. (1978)[1940];** The Nuer: A description of the Model of Livinghood and Political Institutions of a Nilotic People. New York and London, Oxford University Press.

**Fox, Robin (1967).** Kinship and Marriage. Harmondsworth: Penguin Books.

**Goody, Jack ed(1971).** Kinship. London: Penguin

**Goodenough,W.H.(1970).** Description and Comparisonin Cultural Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

**Gough, K (1959).** *"The Nayars and the Definition of Marrige."* Journal of the Royal Anthropological Institute 89: 23-34

**Gupta, Akhil and James Ferguson(1997).** *" Discipline and Practise:`The Field as site, Method and Location in Anthropology."* in Akhil gupta and james Ferguson eds Anthropological Locations. Boundaries and Grounds of a Field Science, London :University of California press

**IAC Newsletter No. 15, December 1993.** *" Early Marriage: Whose Right to Choose?"* Forum on Marriage and the Rights of Women and Children, London.

**International Planned Parenthood Federation (IPPF). (2004).** *" Early Marriage*." Download from the internet at http://www.ippf.org/resource/early_marriage/, July 26

**Islam F.( 2001).** *" Women, Employment and the Family:"* Poor Informal Sector Women Workers of Dhaka City.Unpublished DPhil thesis, University of Sussex.

**Islam F, Mailman N, Acharya K, et al. (2004).** *"Violence against Women within Marriage in Bangladesh."* Report prepared for the Bangladesh Human Rights Advocacy Program, Center for Civil Society and Governance. Washington, DC: Academy for Educational Development.

**Islam M(2005).** Child Wives in Bangladesh. Dhaka : Dhaka University press.

**Kabir, R (1998).** Adolescent Girls in Bangladesh. UNICEF Dhaka.

**Leach, Edmund (1961).** Rethinking Anthropology.London; Athlone Press.

**Levi-Strauss, Claude(1969).** The Elementary Structures of kinship. London: tavistock

**Lienhardt,Godfrey(1964).**Social Anthropology. New York: Oxford University Press

**Mannan, M.A.(2002).** *" Neither Freedom Nor Choice: A Study Of Wife Abuse In Rural Bangladesh."* Dhaka: Bangladesh Freedom Foundation.

**Malinowski, B. (1922).** Argonauts of the Western Pacific. London: Routledge and Kegan paul

**Mead, Margaret (1928).** Coming of Age in Samoa. New York: American Museum of National History.

**Meillassoux, Claude(1981).** Meal and Money: Capitalism and the Domestic Community. Cambridge University Press

**Morgan, L, H (1971).** Ancient Society. University of Arizona Press.

**Moore, Henrietta L.(1988).** Feminism and Anthropology. Cambridge: polity press

**Ortner, Sherry B. and Hariett Whitehead eds (1981).** Sexual Meaning: The cultural construction of Gender and Sexuality. Cambridge: Cambridge University press

**Ortner, S.B. 1984.** Theory in Anthropology since the Sixties. *In: Comparative Studies in Society and History.* Vol. 26 (1): 126-166.

**Saxena, Shobha (1999).** *"Who Cares for Child Marriages?" Pioneer*,29/1/99: Downloaded from the site at www.hsph.harvard.edu/grhf/Sasia/forums/childm

**Schneider, David M. (1984).** A critique of the study of Kinship. Ann arbor: University of Michigan Press

**Schuler, S.R., Bates, L.M., Nanda, G., Islam, F., & Islam M.K. (2005).** *" Early marriage and childbearing in rural Bangladesh."* Download from the internet at http://www.bwhc.org

**Schuler SR, Bates LM, Islam F, Islam MK.( 2006).** *"The Timing of Marriage and Childbearing Among Rural Families in Bangladesh"*: Choosing Between Competing Risks. Social Science & Medicine Forthcoming

**Seymour-*Smith, Charlotte(1986.*,** Macmillan Dictionary of Anthropology. *Macmillan Reference Books, London: The Macmillan press Ltd.*

**Somerset, Carron (2000).** *" Early Marriage: Whose Right to Choose?"* Forum on Marriage and the Rights of Women and Children, London: Save the Children.

**Standing, Hilary(1991).** Dependency and Autonomy. Women's Autonomy and the Family in Calcutta." London:Routledge

**Stone, Lawrence(1977).** "The Family, Sex and Marriage in england 1500-1800." London weidenfeld and Nicolson.

**UN Centre for Human Rights (1995),** *'Harmful Traditional PracticesAffecting the Health of Women and Children'*, Fact Sheet no. 23.Geneva.

**UNICEF(2001).** *"Early Marriage child Spouses."* Florance: Innocenti Research center

**UNICEF (1998).** *"Handbook for the Convention on the Rightsof the Child*." New York:Geneva,

**UNICEF (1994).** *"Too Old for Toys, Too Young for Motherhood."* New York.

**White, Sarah C. (1992).** Arguing with the crocodile.Gender and class in Bangladesh. Dhaka: University press limited.

**Whitehead, Ann (1984).** Men and women, kinship and property: some general issues. In R. Hirschon (ed), Women and property, Women as Property, 176-92. London: Croom Helm.

**এঙ্গেলস (১৯৭২) {১৮৮৪}** - এর 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উদ্ভব', দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, প্রগতি প্রকাশনী, মস্কো।

**রাশেদা, আখতার (২০০১);** সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞানের 'মাঠ'– একটি পর্যালোচনা, সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা-৫৮, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।

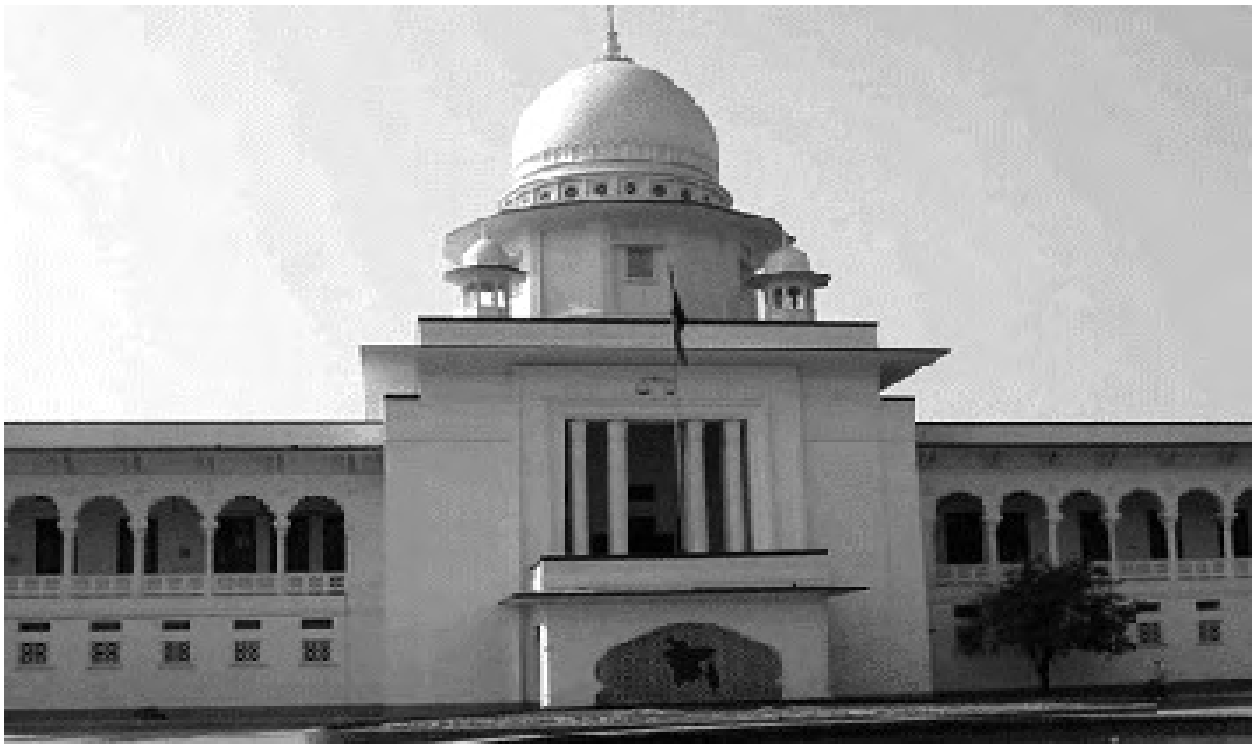

# চলি-শ উত্তর দশকে বিচার ব্যবস্থার স্বপ্ন-নকশা

বাংলাদেশে যে বিচার পদ্ধতি চালু আছে, তার বয়স একশ' বছরের বেশি। এটা চালু হয় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে। এপদ্ধতিকে ইংরেজি ভাষায় বলা হয় 'অ্যাডভারসারি'। এর সরল অর্থ হচ্ছে 'প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক' অর্থাৎ আপোষমূলক নয়। এপদ্ধতিতে বিচারক শুধু নিরপেক্ষ নন, একজন নিরাসক্ত ব্যক্তির ভূমিকায় থাকেন। বিবদমান পক্ষদের নিজ দাবির অনুকূলে আদালতে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত ও যুক্তিতর্ক উত্থাপন করতে হয় এবং এরই ভিত্তিতে বিচারককে রায় দিতে হয়, তাঁকে বিবদমান পক্ষদ্বয় যেভাবে নিজ নিজ 'দাবি' পেশ করেছেন, তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। ইংরেজ শাসন কর্তৃক প্রণীত দেওয়ানি কার্যবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি, সাক্ষ্য-আইন ইত্যাদি বিচারকার্যসংক্রান্ত আইনগুলো সাধারণ সালিশ পদ্ধতির তুলনায় বেশ জটিল এবং সে কারণে মোকদ্দমা চলাকালে তাবৎ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইনজীবী অত্যাবশক এবং সে আইনজীবীর আইনি জ্ঞান ও যুক্তিতর্ক উত্থাপনে দক্ষতার ওপর বিবদমান পক্ষের অনুকূলে রায় পাওয়া অনেকাংশে নির্ভরশীল। অতএব, দক্ষ আইনজীবী নিযুক্ত করা বিচারকার্যক্রমে একটি জরুরি শর্ত। কিন্তু একজন সৎ অথচ গরীব বিচারপ্রার্থীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, ওই গরীব বিচারপ্রার্থীর বিবদমান পক্ষ যদি অসৎ ও অর্থবান হয়, সেক্ষেত্রে মোকদ্দমাটির নিষ্পত্তি বিলম্বিত করার কৌশল তিনি নিতে পারেন– এমনটিই অহরহ আদালতে এখন ঘটছে। আদালত যেন বিবদমান পক্ষের যুদ্ধক্ষেত্র।

বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় আইনের কূটতর্কের সুযোগ নেয়া সম্ভব– এ বিষয়টি ছাড়াও আরো একটি বিষয়ের কারণে মোকদ্দমাগুলো নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হচ্ছে। সেটি হচ্ছে মোকদ্দমা সংখ্যার আধিক্য। একদিকে আদালতগুলো সমাজ নিরপেক্ষ স্থানে এবং ঘটনার স্থান থেকে অনেক দূরে হওয়ায় মিথ্যা মোকদ্দমার সংখ্যা যেমন বাড়ছে। তেমনি পুঁজিবাদী শহর নির্ভর সমাজব্যবস্থা ক্রমাগত খুঁটি গাড়ায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থীদের দায়ের করা মোকাদ্দমার সংখ্যাও বাড়ছে। মোকদ্দমার নিষ্পত্তি বিলম্বিত করা কিংবা মিথ্যা মোকদ্দমা দয়ের করা– এই দুই অপচেষ্টাকে প্রচলিত কার্যবিধির সাহায্যে রোধ করা সম্ভব নয় কিংবা আরো ভয়াবহ বিষয়টি, থানায় মিথ্যা মোকদ্দমা দিয়ে হয়রানি করা তাও রোধ করা সম্ভব নয়।

একাত্তরের আগের কালে সরকারি চাকরির সংখ্যা কম ছিল এবং সে পদগুলোতে নিয়োগ

পাওয়া বাঙালিদের জন্য কষ্টসাধ্য ছিল। সে সময় পড়াশোনায় ভালো যুবকরা পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দেলনে যুক্ত থাকতেন। ফলে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করলেও সরকারি গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিকূল রিপোর্টের কারণে উপযুক্ত চাকরি পেতেন না। এবং আইনজীবী হিসেবে স্বাধীন পেশা পছন্দ করতেন। তাই সে সময়ে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ ব্রিলিয়ান্ট আইনজীবীর আধিক্য ছিল। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে যারা আইনজীবী হতে চাইতেন না, তাদের পক্ষে প্রাদেশিক বিচার বিভাগে মুন্সেফের (এখন সহকারী জজ) চাকরি পাওয়া সহজসাধ্য ছিল এবং তাই ব্রিলিয়ান্ট বিচারকদেরও কমতি ছিল না।

ঔপনিবেশিক শাসনে উপযুক্ত বিচার পাওয়া জনগণের অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি ছিল না। একটি স্বাধীন দেশে ধর্ম, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষভেদ বিবেচনা না করে সব নাগরিক আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী থাকে। এটা সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার এবং তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া জরুরি বিচারকাজে জনগণের সম্পৃক্ততা থাকতে হবে। তা সম্ভব যদি বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে উলে-খিত স্থানীয় শাসনের নকশাটি কার্যকর করা হয়। স্থানীয় শাসনের সবচেয়ে বড় সুফল হলো, সেই এলাকাটি কেন্দ্র করে নাগরিক সমাজ গড়ে ওঠে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ হওয়ায় রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা ও নাগরিক সমাজের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে ওঠে। তখন ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড জনমতের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, বিরাগ-অনুরাগের গণ্ডির বাইরে যেতে সাহস পায় না।

এরআগে বলেছি, বর্তমানে আদালত যেন বিবদমান পক্ষদের একটি যুদ্ধক্ষেত্র। কিন্তু প্রতিটি স্থানীয় শাসনের কেন্দ্রে একটি দেওয়ানি এবং অপরটি ফৌজদারি আদালত যদি থাকে, সে দুটি কোনো ক্রমেই বিবদমান পক্ষগুলোর যুদ্ধক্ষেত্র হতে পারবে না। এখানে সাক্ষ্য-প্রমাণে অসততা কিংবা যুক্তিতর্কে চতুরতা প্রদানের সুযোগ থাকবে না। সেরূপ কৌশল নিলে তাদের সমাজে ধিক্কৃত হওয়ার ভয় থাকবে। অধিকন্তু বিচার পদ্ধতিতে জুরিপ্রথা সংযোজিত করতে হবে। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে দেওয়ানি কি ফৌজদারি বিচারে জুরিপ্রথা চালু আছে। স্থানীয় নাগরিক মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে জুরিদের তালিকা তৈরি করা হবে। আদালতের মামলাটির সত্য বিষয়ক নির্ণয় করার জন্য ওই তালিকা থেকে তিন কিংবা পাঁচজন শপথবদ্ধ জুরির সাহায্যে বিচারক মামলাটি নিষ্পত্তি করবেন। যেহেতু জুরিরা স্থানীয় নাগরিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু বিচারের কাজটি অবশ্যই হবে পক্ষপাতশূন্য মানসিকতায় তাদের স্থানীয় সমাজের সঙ্গে দায়বদ্ধতা থাকার বাধ্যবাধকতার কারণে। তারপরও তাদের নিয়ন্ত্রণে বিচারক যেমন থাকছেন, তেমনি তারাও বিচারকের সহায়ক নিয়ন্ত্রণে থাকছেন। ফলে গোড়াতেই মোকদ্দমার সংখ্যা কমবে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে।

*বর্তমানে আদালত যেন বিবদমান পক্ষদের একটি যুদ্ধক্ষেত্র। কিন্তু প্রতিটি স্থানীয় শাসনের কেন্দ্রে একটি দেওয়ানি এবং অপরটি ফৌজদারি আদালত যদি থাকে, সে দুটি কোনো ক্রমেই বিবদমান পক্ষগুলোর যুদ্ধক্ষেত্র হতে পারবে না। এখানে সাক্ষ্য-প্রমাণে অসততা কিংবা যুক্তিতর্কে চতুরতা প্রদানের সুযোগ থাকবে না। সেরূপ কৌশল নিলে তাদের সমাজে ধিক্কৃত হওয়ার ভয় থাকবে।*

এ প্রসঙ্গে আমার কর্মজীবনের একটি ঘটনা উলে-খ করা যেতে পারে। চার বছর হলো রাজশাহী জজ আদালতে আমি আইন ব্যবসা করছি। বাঙালি একজন চাষি জমিদার কর্তৃক প্রদত্ত খাজনা আদায়ী দাখিলা জাল করে তার ভিত্তিতে এক সাঁওতাল চাষির স্বত্বদখলীয় জমি নিজ নামে রেকর্ড করে নিলে তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করার জন্য ওই সাঁওতাল চাষি আমার চেম্বারে আসেন। নালিশি জমিতে তার স্বত্ব থাকা এবং সদ্য প্রস্তুত রেকর্ডটি অশুদ্ধ মর্মে একটি ঘোষণামূলক ডিক্রির প্রার্থনায় আদালতে মোকদ্দমা করা হলো। অবশেষে মোকদ্দমাটির চূড়ান্ত শুনানি শুরু হলো। বাদী সাঁওতাল চাষিকে বিবাদীপক্ষের আইনজীবী যখন জেরাতে প্রশ্ন করলেন, জমিতে কি তার দখল আছে? তখন তিনি 'না' বললেন। আমি তো হতবাক! এউত্তর দেয়ার অর্থ মোকদ্দমাটি ডিসমিস হবে। বিবাদী এখন বলার সুযোগ পাবেন যে, তিনি বারো বছরের ঊর্ধ্বকাল ধরে জমিটির জবরদখলে আছেন, ফলে তাতে বাদীর স্বত্ব থাকলেও তা লোপ পেয়েছে। পরদিন বিবাদীপক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দি ও জেরার জন্য শুনানি মুলতবি হলো।

রাতে চেম্বারে আমার মক্কেলকে জিজ্ঞাস করে জানলাম, নালিশি জমি নিচু হওয়ায় বর্ষাকালে ২-৩ মাস জলমগ্ন থাকায় কোনো আবাদ করা হয় না। এখন বর্ষাকাল, তাই ওই প্রশ্নের উত্তরে তিনি 'না' বলেছেন। এদিকে সরল মানুষটির সরল উত্তরে তার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। আমার তখন আগের পড়া প্রিভি কাউন্সিলের রায়ের কথা মনে পড়লো। রায়টিতে এসিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে যে, বছরের কোনো সময়ে যদি কোনো জমি দখল ভোগ করা না যায়, সে ক্ষেত্রে ওই সময়টুকুতে জমির স্বত্ব প্রকৃত মালিকের ওপর বর্তাবে অর্থাৎ তেমন জমিতে জবরদখলকারী ব্যক্তি কখনো টানা বারো বছরের দখলজনিত স্বত্ব দাবি করতে পারবেন না।

পরদির আমি চাতুরি করে বিবাদীকে সরাসরি না করে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলাম, নালিশি জমিতে তো সারা বছর চাষাবাদ হয়। আমি জানতাম, বিবাদী অসৎ লোক। কাজেই অতি চালাক হতেই হবে এবং সে কারণে সে ভাবল, আমি চাইছি 'হ্যাঁ'– বোধক উত্তর। তাই সে 'না'– বোধক, কিন্তু সত্যটিই বলল, 'না, বছরে ২-৩ মাস বর্ষাকালে চাষাবাদ করা যায় না।' অতঃপর আমার মক্কেলের অনুকূলে রায় হলো।

প্রিয় পাঠক, বর্তমানে বিচার ব্যবস্থায় সঠিক বিচার পাওয়া যে অনিশ্চিত উপরোক্ত ঘটনায় তা নিশ্চয়ই বোধে এসেছে। বিচার ব্যবস্থার স্বপ্ন-নকশায় সে অনিশ্চয়তা কখনো থাকবে না। ▣

**মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী** : অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, আপিল বিভাগ, সুপ্রিম কোর্ট, বাংলাদেশ।

# গণতন্ত্রের দু'দশকে নারীর অর্জন

এ লেখার শুরু ডিসেম্বরে। ২০১০ সালের এসময়টিতে বাংলাদেশ নীরবে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত অতিক্রম করছিল। স্বাধীনতার ৪০ বছর পার হলো তার। এ ডিসেম্বরেই মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভ করে দেশটি। আবার যুদ্ধ-উত্তর দেশে এর বড় অর্জন, সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তনের সংগ্রামেও জয়ী হয় এ ডিসেম্বরেই ১৯৯০ সালে। সে-ই সূত্রে চলিত সময়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্র তার দু'দশক অতিক্রম বলা যায়।

**গণতন্ত্রের অভিভাবক হয়ে আছেন হাসিনা-খালেদা**

পেছন ফিরে দেখার জন্য ২০১০ সালের ডিসেম্বর অনন্য এক সময়। একাত্তরের তরুণরা এখন বার্ধক্যে থাকলেও জাতীয় রাজনীতি ও আর্থসামাজিক পরিসরে এখনো সক্রিয় তারা। আর নব্বইয়ের প্রজন্ম সব খাতের ধীরে ধীরে নেতৃত্ব নিচ্ছেন। এ দুই প্রজন্মেরই নেতা হয়ে আছেন হাসিনা-খালেদা। শেখ মুজিবর রহমান এবং জিয়াউর রহমানের দীর্ঘ ছায়ার মধ্যে থেকেও বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রকৃত আভিভাবক হয়ে উঠেছেন ওই দুই নারী।

এ দেশের সমাজ জীবনে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল যিনি শেখ হাসিনা বা খালেদা জিয়াকে নিয়ে সমালোচনামুখর নন। কিন্তু আবেগপ্রবণ বাঙালিদের এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার মতো বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশের সমাজে দুর্লভ যে, এ দু'জনের প্রবল উপস্থিতির কারণেই দেশটি একদিকে যেমন সামরিকতন্ত্র থেকে রক্ষা পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মোল-াতন্ত্র তাদের বিষয়ে সমাজে রাজনৈতিক আগ্রহ তৈরি করতে পারেনি। উপরন্তু শহর ছাড়িয়ে গ্রামের পথে ধাবমান দেশটির আপত যে চাকচিক্য এরও গোড়াপত্তন বিশেষভাবে নববইয়ের সেনাশাসন বিদায়ের পর থেকেই।

হাসিনা-খালেদার রাজনীতি শুরু হয়েছিল একেবারে শূন্য থেকে। চারপাশে ছিল অনির্ভরযোগ্য একদল সহকর্মী এবং গোয়েন্দা বিভাগগুলোর নানা ষড়যন্ত্র। কিন্তু দু'জনেরই কঠোর সমালোচকরাও স্বীকার করবেন, আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমান যেখানে রেখে

যান, তাদের দুই পারিবারিক উত্তরসূরি সে জায়গা থেকে উভয় দলে শক্তি-সামর্থ্য এখন অনেক বাড়িয়েছেন। বাংলাদেশের তিন কোটি পরিবারের প্রায়টিতে এখন হাসিনা-খালেদা উভয়ের অন্তত একজন করে অনুসারী রয়েছেন। রক্ষণশীল ও পশ্চাৎপদ একটি মুসলিম সমাজে নারী হয়েও তাদের এরূপ সাফল্য ঈর্ষণীয় বৈকি।

কোনো দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহী পদ একনাগাড়ে নারীদের দখলে থাকার ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী সময়ের রেকর্ডটি এখন বাংলাদেশের। কিন্তু নারীনেত্রীরা এতে সন্তুষ্ট নন। প্রায় দশ বছর করে উভয়ে প্রধানমন্ত্রী থাকলেও হাসিনা-খালেদা নারীর ক্ষমতায়নে সামর্থ্যের চেয়ে অনেক কমই করেছেন বলা যায়। খালেদা জিয়ার থেকে হাসিনা এক্ষেত্রে অবশ্য বাড়তি কিছু নম্বর পাবেন। তার ক্যাবিনেটে গুরুত্বপূর্ণ অনেক পদে নারীদের বাছাই করেছেন তিনি। এটাও এক ধরনের পালাবদলের ইঙ্গিতবহ।

**গণতন্ত্রের মধ্যে নারী যেভাবে জাতীয় অর্থনীতির ভিত গড়ে দিচ্ছে**

বহির্বিশ্বে কিছুটা মজা করেই বলা হয়, বাংলাদেশ সর্বশেষ দু'দশকে মোট তিনটি বড় সাফল্য অর্জন করেছে। প্রথমতো. তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ, দ্বিতীয়ত. ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির সুরক্ষা এবং তৃতীয়ত. ক্রিকেটে টেষ্ট স্ট্যাটাস পাওয়া। লক্ষণীয়, প্রধান দুটি সফলতার পেছনেই রয়েছেন নারী, বিশেষত নিম্নবিত্ত পরিবারের নারীরা।

তৈরি পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে চীন ও তুরস্কের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। প্রবণতা এখন এমন যে, চীন থেকে অনেক গার্মেন্ট কারখানা বাংলাদেশে চলে আসছে। বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্তি, কর্মসংস্থানের সুযোগ, আমদানি ব্যয় মেটানো ইত্যাদি বিবেচনায় জাতীয় অর্থনীতির প্রধান ভরসা এখন গার্মেন্ট খাত। কয়েক বছর ধরে লাগাতার প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে গার্মেন্ট খাত যে বিপুল মুদ্রা বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছে, এর ফলে অন্যান্য অর্থনৈতিক পণ্যেরও ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। ওই সূত্রে বলা যায়, এখানকার দৃশ্যমান প্রতিটি বিলাসী পণ্যের পেছনেই পোশাক খাতের নারী শ্রমিকদের অশ্রু-ঘাম-রক্ত মিশে আছে। আজ রাজনীতিবিদরা স্বল্পোন্নত অবস্থা থেকে দেশটি 'মধ্য আয়ের দেশ'– এ পরিণত করার যে কৃতিত্ব নিচ্ছে বা নিতে উদগ্রীব তাও আসলে নারী শ্রমিকদেরই প্রাপ্য।

*স্বাধীনতার পর 'তলাবিহীন ঝুঁড়িতে যখন দারিদ্র্য ও রাজনৈতিক অব্যবস্থাপনা দুর্ভিক্ষের জন্ম দেয় তখন বেপরোয়া নারী ক্ষুদ্রঋণকে আঁকড়ে ধরে ওই অর্থনীতিকে আবার সোজা করে দাঁড় করালেন। এ কাজ করতে গিয়ে, গার্মেন্টের নারীরা যেভাবে শ্রম শোষণকে অবজ্ঞা করেছেন, ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা নারীও তেমনি সুদখোরদের ব্যাংকিং মারপ্যাঁচে ভেঙে পড়েননি। এভাবেই গ্রামীণ ব্যাংক থেকে জন্ম নিয়েছে গ্রামীণ ফোন, ব্র্যাক থেকে ব্র্যাক ব্যাংক।*

বিশেষজ্ঞরা বারবারই বলেন, মূলত স্থানীয় নারীদের শস্তা শ্রমই গার্মেন্ট শিল্প বিকাশের প্রধান ম্যাজিক। পুরোপুরি সত্য তা। কিন্তু প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক নির্মম ওই শ্রমশোষণ মেনে নিচ্ছেন। কারণ পারিবারিক দাসীবৃত্তির ঐতিহাসিক কাঠামো থেকে বের হওয়ার যে সুযোগ খুঁজছিল নারী সমাজ, 'ফ্যাক্টরি' তাকে সে সুযোগ করে দিয়েছে।

আজ বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে নারী ভোটারদের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ ভোট কেন্দ্রে যায়। সত্তরের দশকে তা কল্পনা করাও কঠিন ছিল। শ্রমশোষণের আবহাওয়ায় থেকেও নারীর একটি স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য আর্থসামাজিক মতামত তৈরি হচ্ছে। এটি এখনো এ দেশের সমাজ বিজ্ঞানীদের যথাযথ মনোযোগ পেয়েছে বলে মনে হয় না। 'পার্টি অফিস'গুলোও তাদের ঠাঁই দিতে নারাজ।

পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকদের অবদান পুঁজি করে জাতীয় পর্যায়ে যেমন কারখানা মালিকদের একটি প্রভাবশালী অবস্থান তৈরি হয়েছে, ঠিক তেমনি গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা নারীদের অবদান ব্যবহার করে বাংলাদেশ পেয়েছে প্রথম নোবেল ও নাইট খেতাব। মুহাম্মদ ইউনূস, ফজলে হাসান আবেদ প্রমুখ ব্যক্তিকে ঘিরে সার্বক্ষণিক জারি থাকা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচারণার মধ্যে খুব কম প্রত্যক্ষদর্শীরই এখন মনে পড়বে মিরপুরের গ্রামীণ বা প্রশিকা ভবন, শ্যামলীর আশা ভবন ইত্যাদি সুউচ্চ দালানগুলোর প্রতিটি ইটে রয়েছে লাখ লাখ গ্রামীণ নারীর হিস্যা।

গার্মেন্ট ও ক্ষুদ্রঋণ– এই দু'ধারায় নারীদের দেশ গঠনমূলক ভূমিকার প্রতি আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যাপক স্বীকৃতি সত্ত্বেও দেশে তারা মোটেই সমাজের তারকা নন। এ কারণে দেখা যায়, পোশাক তৈরিকারী নারী শ্রমিকরা যখন মজুরির আন্দোলনে দানা বেঁধে ওঠে তখন তা 'ষড়যন্ত্র' হিসেবে অভিহিত হয় 'সিভিল সমাজ'- এ। আবার ক্ষুদ্রঋণের সুদের হার কমানোর আর্তিও কোনো সরকারের সহানুভূতি পায়নি, এমনকি নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য প্রণীত 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি'ও কেবল মাদ্রাসা কেন্দ্রিক কমিউনিটির বিরোধিতার ভয়ে কার্যকর হয়নি দেশে।

**শিক্ষা, উন্নয়ন ও গণমাধ্যমের ফ্রন্টলাইনেও জায়গা করে নিল নারী**

বিশ্ব কূটনৈতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ অনেক সময়ই 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ রকম একটি দেশেই গত ২০ বছরে অভাবনীয় সাফল্য ঘটেছে শিক্ষা ক্ষেত্রে। প্রাথমিক পর্যায়ে এখন প্রায় ৯০ শতাংশ শিশু স্কুলে যাচ্ছে যাদের মধ্যে ছেলেশিশুদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলছে মেয়েশিশুরাও। যে সমাজে মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়ায়ও ছিল নিষেধাজ্ঞা, যেখানে বাবা, ভাই এবং স্বামীর বাইরে আর সবাই 'পরপুরুষ' এবং মেয়েরা গণ্য হতো দ্বিতীয় শ্রেণীর মানব প্রজাতি হিসেবে সেখানে কোটি কোটি ছেলেমেয়ে এক কাতারে পড়ছে এবং সমমর্যাদা নিয়ে বহির্জগতে পা ফেলছে– এ দৃশ্য কেবল অস্বাভাবিকই নয়, অভাননীয়ও বটে।

নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে গত দু'দশকে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্ব পরিসরে এখন এক দৃষ্টান্ত। ১৯৯০ সালে সামরিক শাসনের পরাজয়ের পরই খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার সরকার পালাক্রমে নারী শিক্ষায় বিরতিহীনভাবে দৃঢ়

অঙ্গীকার ব্যক্ত করে চলেছে। মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা, তাদের বেতন মওকুফ, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃতি ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রশাসনিক অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন শুরু হলেও শিক্ষা বিষয়ে মূল বিপ-বটি হয়েছে মেয়েদের মনোজগতে। রাজধানী থেকে সুদূরের পল-ী সমাজেও 'স্কুলে যেতে হবে', প্রয়োজনে বোরকা পরে হলেও এমনোভাব এখন প্রশ্নহীন। ঘর কিংবা উঠোন নারীর জন্য নির্ধারিত ঐতিহাসিক চৌহদ্দি ভেঙে পড়ছে। এ বিষয়ে সমাজকে প্রস্তুত করতে এনজিও এবং গণমাধ্যমও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

**স্বাস্থ্য সুবিধার অভাব, সহিংসতা এবং নারী উন্নয়ন নীতির বিরোধিতা**

গণতন্ত্রের মধ্যে বিগত দুই দশকে নারীর জন্য সবচেয়ে হতাশা ও ক্ষোভের ক্ষেত্র হলো তার বিরুদ্ধে অব্যাহত সহিংসতা রুখতে না পারা এবং তার জন্য জরুরি স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা। শিক্ষা ক্ষেত্রে গত দুই দশকে যে দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার দেখা গেছে অনুরূপ অঙ্গীকার এখন প্রয়োজন নারীর স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামো তৈরি এবং সহিংসতা বন্ধের ক্ষেত্রে।

**নারীর বিরুদ্ধে প্রধান চ্যালেঞ্জ সহিংসতা**

নারীর বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সহিংসতার কারণ পুরুষতন্ত্রের মনস্তাত্ত্বিক টানাপড়োন এবং সমাজে বিকাশমান পুঁজিবাদী ভোগবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে নিহিত। ঐতিহাসিকভাবে জারি থাকা পুরুষতন্ত্র নারীর অগ্রযাত্রায় কিছুটা কিংকতর্ব্যবিমূঢ় এবং হীনতা আক্রান্ত। যেহেতু গণতন্ত্রের চরিত্রই এমন যে, সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সামনে আসতে প্ররোচিত করে এবং সুযোগও করে দেয় সে কারণে নারীর গুণগত ও পরিমাণগত অগ্রযাত্রা এখন প্রায় অবধারিত। তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশ ও শিল্প-অর্থনীতির বিকাশ যে পথে এগোচ্ছে তাও একালে নারী উন্নয়ন বেগবান করতে বাধ্য।

যেহেতু সমাজে নারী একই সঙ্গে উৎপাদন ও উৎপাদন পণ্য ভোগের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠছে সে কারণে তাকে চার দেয়ালে আটকে রাখার সুযোগ নেই এবং চার দেয়ালের সময়টুকুতেও তার সঙ্গে আপোষরফার কোনো বিকল্প নেই পুরুষতন্ত্রের সামনে। যুগের এসত্য মেনে নেয়া সবার জন্য সহজ নয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভবও নয়। হয়তো বাংলাদেশে এপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে আরো কয়েক দশক সময় নেবে। আলোচিত এক্রান্তি কালই চলতি সময়ে নারী বিরোধী সহিংসতা বাড়িয়ে চলছে।

*নারীর বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সহিংসতার কারণ পুরুষতন্ত্রের মনস্তাত্ত্বিক টানাপড়োন এবং সমাজে বিকাশমান পুঁজিবাদী ভোগবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে নিহিত। ঐতিহাসিকভাবে জারি থাকা পুরুষতন্ত্র নারীর অগ্রযাত্রায় কিছুটা কিংকতর্ব্যবিমূঢ় এবং হীনতা আক্রান্ত। যেহেতু গণতন্ত্রের চরিত্রই এমন যে, সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সামনে আসতে প্ররোচিত করে এবং সুযোগও করে দেয় সে কারণে নারীর গুণগত ও পরিমাণগত অগ্রযাত্রা এখন প্রায় অবধারিত। তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশ ও শিল্প-অর্থনীতির বিকাশ যে পথে এগোচ্ছে তাও একালে নারী উন্নয়ন বেগবান করতে বাধ্য।*

আমাদের সমাজে সামন্ততন্ত্র বংশগত ও লিঙ্গগত মর্যাদার যে শিক্ষা রেখে গেছে, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে তা অচল এ ধারণা নবীন প্রজন্ম কোনভাবেই পায় না। যেহেতু তার শৈশব তৈরি হচ্ছে পরিবার ও স্কুলে, পুরনো মূল্যবোধে– সে কারণে বহির্জগতে এসেই নারীর ক্রমবর্ধিষ্ণুতা তাকে আরো অসহিষ্ণু করে তোলে। অন্যদিকে বাণিজ্য নির্ভর সমাজের ক্রেতাবাদ, ভোগবাদ এবং সর্বগ্রাসী বিজ্ঞাপন তাকে নারী সম্পর্কে এক ধরনের স্থূল ধারণা দিয়ে চলেছে। পূর্বোক্ত অসহিষ্ণুতার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের স্থূলতা এবং বিকৃত যৌনতা যুক্ত হয়ে সমাজে নারী-পুরুষের এক ধরনের অস্বাভাবিক অবস্থা তৈরি করেছে। বাণিজ্য ও বিপণন নির্ভর সমাজ নারীর প্রতি এবিকৃতি, অসহিষ্ণুতা ও ভোগবাদীতা উসকে দিচ্ছে এবং পুরুষকে অসুস্থ করে তুলছে এবং সেই অসুস্থতার সহিংস শিকার হতে হচ্ছে নারীকে।

**গ্রহণকাল হবে সাময়িক : নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন উৎসবমুখর পরিস্থিতি তৈরি করবে**

যেহেতু ইতিহাস তার এপর্যায়ে নারীকে উন্নয়নের অপরিহার্য অংশ হিসেবে দেখতে দৃঢ় সেকারণে 'দুর্বল' প্রকৃতির বাংলাদেশ রাষ্ট্রকেও নারীর সুরক্ষার জন্য প্রশাসনকে ঢেলে সাজাতে হবে। এক্ষেত্রে এসেই নারী উন্নয়ন নীতির অনুমোদন ও বাস্তবায়ন এখন সময়ের এক অপরিহার্য দাবি এবং চাহিদায় পরিণত হয়েছে। মোল-াতন্ত্রের প্রবল আপত্তি গুঁড়িয়ে দিয়ে যেমন করে জাতীয় সংসদে শিক্ষানীতি অনুমোদিত হয়েছে, একইভবে বর্তমান সরকার নারী উন্নয়ন নীতি সম্পর্কেও দৃঢ়তা দেখাবে বলে নারী আন্দোলন কর্মীরা আশা করছেন। নারী উন্নয়ন নীতি অনুমোদিত হলে এবং এর প্রকৃত বাস্তবায়ন শুরু হলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পরবর্তী দুই দশক হবে নারীর জন্য উৎসবমুখর। ◻

**আলতাফ পারভেজ** : গবেষক এবং সাংবাদিক

## লেখা আহ্বান

'নাগরিক উদ্যোগ বার্তা' নিয়মিতভাবে মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার, নারীর অধিকার সংশি-ষ্ট বিষয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে মননশীল ভাবনা-চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, সাক্ষাৎকার, সমালোচনা, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, সংগঠন এবং ব্যক্তির ইতিবাচক কর্মপ্রচেষ্টা তুলে ধরার চেষ্টা করে প্রতি সংখ্যায়। এ বিষয়ে আপনার লেখা দ্রুত পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়। পাশাপাশি পত্রিকা সম্পর্কে যে কোনো গঠনমূলক সমালোচনাও আমাদের প্রয়াস সার্থক করবে।

# শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের লাগাম টানা জরুরি

## রাশেদা কে. চৌধূরী

*রাশেদা কে. চৌধূরী সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা। বর্তমানে তিনি শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে কাজ করছে এমন সহস্রাধিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সমন্বয়ক প্রতিষ্ঠান 'গণসাক্ষরতা অভিযান'-এর নির্বাহী পরিচালক। নাগরিক উদ্যোগ বার্তার সাথে তিনি কথা বলেছেন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা, বর্তমান শিক্ষা নীতি এবং শিক্ষা অধিকার আন্দোলনের নানা দিক নিয়ে। তার সুচিন্তিত মতামত অনুসন্ধানী পাঠকদের নতুন চিন্তার খোরাক হবে।*

**গত ৭ ডিসেম্বর ২০১০ 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়েছে। এনীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক কোনগুলো বলে আপনি মনে করেন? এটি বাস্তবায়নে নির্দেশানাই বা কি?**

বর্তমান শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য দিক হলো শিক্ষার সর্বস্তরে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য দূর করার জন্য বিভিন্নমুখী দিক নির্দেশনা দেয়া, দ্বিতীয়ত: শিক্ষার মানের অধোগতি রোধ করার জন্য এ নীতিতে যথাযথ শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কার্যকর শিক্ষা-শিখন প্রক্রিয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ তৈরি, আবকাঠামো উন্নয়ন, কারিগরি ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা, প্রাকপ্রাথমিক, বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, জনমুখী শিক্ষা প্রশাসন, কার্যকর মূল্যায়ন পদ্ধতি বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান ইত্যাদি।

বাস্তবায়ন নির্দেশনার মধ্যে তিনটি বিষয় আছে– শিক্ষানীতি হলো একটা জাতির প্রত্যাশার কতগুলো মোটা দাগে প্রতিফলন। যেমন– বলা আছে শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইন করতে হবে। এটা একটা নির্দেশনা মাত্র। এটাকে আরো সুনির্দিষ্ট করতে হবে। দ্বিতীয়ত: এটা একটা দলিল মাত্র তাই এটা প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না যে, রাতারাতি বা এক বছরে সব বাস্তবায়ন হয়ে যাবে। তৃতীয়ত: শিক্ষানীতি যেভাবে এসেছে তা বাস্তবায়নে বিনিয়োগ প্রয়োজন। তা নিশ্চিত করতে হবে। নাহলে এর যথাযথ ফল আমরা পাবো না। এটা দলিলই থেকে যাবে। একটা বিষয় এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা আমাদের শিক্ষামন্ত্রী এবং এ নীতি প্রণেতারা বলেছেন, এটা কোনো ধর্ম গ্রন্থ নয়। এটি প্রয়োজনে পরিবর্তন, পরিমার্জন সংযোজন করতে হবে।

**একটু পেছনে ফিরে যেতে চাই। আমরা জানি, নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশ সরকার থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত Jomtien World Conference on Education for All (EFA) সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা' প্রবর্তন করে। এসম্মেলনের অঙ্গীকারগুলো আমরা কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছি?**

আমরা সবাই জানি, নব্বইয়ের দশকে আমাদের দেশে সামরিক শাসক ছিল। আমাদের তৎকালীন সরকার Jomtien World Conference on Education for All (EFA) সম্মেলনে অংশগ্রহণের প্রাক্কালে তাড়াহুড়া করে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ জারি করেছিলো। যা পরবর্তী সময়ে আইনে রূপ নেয়। এছাড়া আরো কিছু অঙ্গীকার ঐ সম্মেলনে ছিল যা আমরা তেমন বাস্তবায়ন করতে পারিনি। যেমন– ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা। এটা একটি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী, যার বাস্তবায়ন তো করাই যায়নি, বরং বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার চাপে আরো নতুন শিশু এবং অনেক বয়স্ক মানুষ নিরক্ষরের তালিকায় যুক্ত হয়েছে। এটা শুধু বাংলাদেশের বিষয় নয়, পৃথিবীব্যাপী একটি চিত্র। তবে ২০০০ সালে আবার একটি পর্যালোচনা হলো। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এবং গবেষকরা সেনেগালের রাজধানী ডাকারে সম্মিলিত হয়ে আবার দেখলেন, সবার জন্য শিক্ষা আন্দোলন আসলে কিছু শিশুর জন্য স্কুলিংয়ে পর্যবসিত হয়েছে, সবার জন্য হয়নি। ফলশ্রুতিতে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে আরো ৬টি নতুন লক্ষ্য ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জনের নির্ধারণ করা হলো।

**এমডিজি বা সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় সকলের প্রাথমিক শিক্ষা পাবার অধিকার এবং শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে 'লৈঙ্গীক ন্যায়পরতা'র নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে। এটি আমাদের দেশের বাস্তবতায় কতটুকু কার্যকর বলে আপনি মনে করেন? বর্তমানে প্রণীত শিক্ষানীতি কি এলক্ষ্য পূরণ করতে পারবে?**

শিক্ষার ক্ষেত্রে সহসব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের থেকে ডাকার ঘোষণা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি অনেক কিছু এসেছে। এ কারণে কিছু বিষয় খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এমডিজির দ্বিতীয় লক্ষ্যে সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ডাকার ঘোষণায় এর চেয়ে বেশি কিছু যুক্ত করা গেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন ঘোষণায় কোটি কোটি বয়স্ক নিরক্ষর মানুষের কথা বলা হয়নি। যা ডাকার ঘোষণায় এসেছে। নারীর শিক্ষা অর্জনের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে এসেছে। জেন্ডার জাস্টিস একটি ক্রসকাটিং ইস্যু। তাই এটি শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

শিক্ষায় এমডিজির লক্ষমাত্রা বাস্তবায়ন আমি মনে করি না অসম্ভব। তবে এর জন্য

রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা প্রয়োজন। তা থাকলেও কখনো কখনো পরিকল্পনা, কার্যক্রম এবং কৌশলের ঘাটতি ও দুর্বলতা আছে। এর বাইরেও প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া নারীর প্রতি সহিংসতার কারণে এমডিজির অর্জন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। ইভ টিজিং বা নারীকে উত্ত্যক্ত করায় অভিভাবকদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছে। শিক্ষমন্ত্রীই আশঙ্কা করেছেন, এতে বাল্যবিয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে। মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার হার কমে যেতে পারে। কাজেই, নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।

মতো নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েরা মাতৃভাষা না থাকার কারণে পড়তে পারছে না। বিভিন্ন হাওর-বাওড়, চরাঞ্চল, উপকূলের জনগোষ্ঠী বা পাহাড়ি অঞ্চল যেখানে শিশুদের জন্য কাছাকাছি কোনো স্কুল না থাকে তাহলে তার জন্য স্কুলে টিকে থাকা কষ্টকর। মা-বাবা কিংবা শিশুরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। কাজেই ঝরে পড়া রোধ করতে হলে দেখতে হবে তারা কারা? তবে এটা বলা যায়, আমাদের পড়ার চাহিদার জায়গাটি তৈরি হয়ে গেছে। আমরা যেখানে হোঁচট খাচ্ছি, তা হলো আমরা সর্বত্রগামী হতে পারছি না।

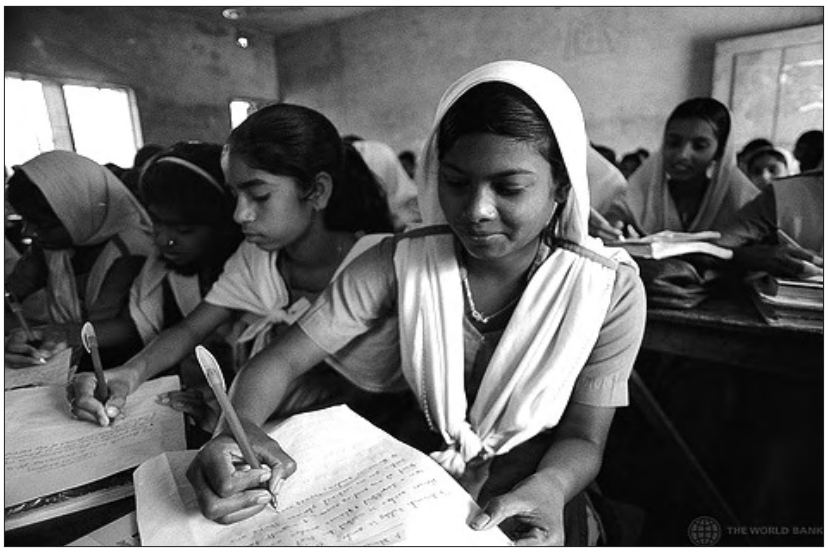


**আমাদের দেশের বাস্তবতায় উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা হতাশাজনক বাস্তবতা থাকলেও প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। তবে ইএফএ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৯ ইউনেস্কোতে বলা হয়েছে, দেশে এখনো ১১ শতাংশ শিশু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ছে? এঝরে পড়ার হার কীভাবে রোধ করা যায় বলে আপনি মনে করেন?**

আন্তর্জাতিক মহল, সরকার এবং বেসরকারি পর্যায় থেকেও ঝরে পড়া রোধের প্রতি নজর দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষানীতিতেও অঙ্গীকার আছে। কিন্তু রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকার পরও এঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ আমাদের এখন পর্যন্ত শিক্ষায় যে পরিকল্পনাগুলো আছে তা মোটা দাগে সবার জন্য। কিন্তু সবার জন্য এক ঔষুধে চলবে না। দেখা যায়, দরিদ্রতার কারণে এক দল ঝরে পড়ছে। আবার অন্য আরেকটি দল যেমন– আদিবাসী কিংবা দলিত জনগোষ্ঠীর

**ঝরে পড়া রোধকল্পে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, উপবৃত্তি, দুপুরে খাবার ব্যবস্থা কতটুকু সহায়ক হবে বলে মনে করেন?**

বর্তমানে ঝরে পড়া রোধে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত নানা কর্মসূচির মধ্যে উপবৃত্তিটাই জাতীয় পর্যায়ে আছে। আর বাকিগুলো এখনো প্রকল্পভিত্তিক। দুপুরের খাবার প্রদানের বিষয়টিকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাই। কারণ ক্ষুধা পেট নিয়ে কারোরই কাজ করতে ভালো লাগে না। তবে এ ব্যবস্থা সকলের জন্যই নিশ্চিত করতে হবে। একই স্কুলের কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে অন্তর্ভুক্ত করে নয়। ভারতের তামিলনাড়ুতে দেখেছি, একার্যক্রমে অভিবাবকদের, বিশেষত মায়েদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ জন্য কিছু সম্মানীও তাদের প্রদান করা হচ্ছে। কোনো মা তাদের বাচ্চাকে খারাপ খাবার দিবেন না। তাই এটা বেশ সফল একটি উদ্যোগ হয়েছে। কোনো কোনো এনজিও এটা আমাদের দেশেও বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে। কাজেই সরকারের প্রতি আমার অনুরোধ, এ সফল উদ্যোগগুলো থেকে শিক্ষা নিন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, বাচ্চা তো ক্লাসে আসে কিছু শিখবে বলে। কাজেই ঝরে পড়া রোধে শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ আমরা কতটুকু আনন্দময় করতে পেরেছি তা গুরুত্বপূর্ণ। বাকি প্রচেষ্টাগুলো সহায়ক হবে।

এবার সরকার ২৩ কোটি নতুন বই যথাসময়ে শিশুদের হাতে তুলে দিয়েছে। এ ২৩ কোটি বইয়ের জন্য প্রচুর বিনিয়োগ করতে হয়েছে। আমরা প্রতিটি শিশুর জন্য একটি বই না করে প্রতিটি শ্রেণীকক্ষের জন্য পঞ্চাশ রকমের বই করতে পারি। শ্রেণীকক্ষের মধ্যেই যদি নানা বৈচিত্র্যময় বই দেয়া হয় তাহলে আমার তো মনে হয় না যে- কোনো শিশু আগ্রহ নিয়ে এগুলো পড়বে না, দেখবে না। উন্নত বিশ্বে পাঠ্যবই বলে কিছু নেই। নানা রঙে বর্ণিত সহায়ক যেকোনো বই তারা পড়তে পারে।

শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির মৌলিক প্রশ্নটির সাথে তাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করাও খুব জরুরি। একটি স্কুলে নানা আর্থ-সামাজিক অবস্থার ছেলেমেয়েরা আছে। তাদের প্রতি আমরা সমান দৃষ্টিভঙ্গি রাখছি কিনা। যেমন– ক্লাসরুমে যদি কোনো প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী থাকে তাহলে তাকে আমরা কীভাবে সহযোগিতা করছি তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দলিত বা আদিবাসী বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি থাকলে তাদের প্রতি শিক্ষকদের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত তাও দেখা জরুরি। সম্প্রতি সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতির (Inclusive Education) ওপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়েছে। বিশ্বায়নের জায়গা থেকেও আমরা একটা প্রতিযোগিতার মধ্যে আছি। শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করেছি। এখানে সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক সমাজে অবশ্যই বিভিন্ন পছন্দ থাকবে। তবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে সবকিছুর মধ্যে একটি ন্যূনতম মান বিদ্যমান রাখা। একটি নিয়মতান্ত্রিক পরীবিক্ষণ প্রয়োজন, শুধু টাকাই শেষ কথা নয়।

**আমরা জানি, এঝরে পড়া শিশুদের জন্য সরকার, বিশ্ব ব্যাংক এবং এসডিএস - এর অর্থায়নে সকলের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'আনন্দ স্কুল' গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু ২৬ নভেম্বর ২০১০ দৈনিক সমকাল থেকে জানা যায়, এ স্কুলগুলো শিক্ষা তো নিশ্চিত করছেই না, বরং কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত জেএসসি (জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট) এবং জেডিসি (জুনিয়র**

**দাখিল সার্টিফিকেট) পরীক্ষায় অংশ না নেয়া পৌনে তিন লাখ শিক্ষার্থীর সিংহভাগই হচ্ছে এসকল স্কুলের কিংবা বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত স্কুলের শিক্ষার্থী– এ বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখেন?**

এখানে একটি বিষয় আছে। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় গড়ে সবচেয়ে ভালো করেছে পিটিআই সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরি স্কুলগুলো। এরপর ভালো করেছে ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলগুলো। শতকরা ৯৩ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে। কাজেই সেখানে তো এনজিও বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো খারাপ করেনি। কিন্তু জেএসসিতে (জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট) একটি বিশেষ ক্যাটাগরির স্কুল 'আনন্দ স্কুল' খারাপ করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের পরিচালনায় এ প্রকল্প যেভাবে তড়িঘড়ি করে নেয়া হয়েছে, যেভাবে এনজিও পার্টনার নির্বাচন করা হয়েছে, যেভাবে কাজ চলছে তা নিয়ে জনগণের নানা প্রশ্ন আছে। এরা কারা তা নিয়েও প্রশ্ন আছে।

**তাছাড়া সরকারি, বেসরকারি এবং ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর পাঠদান পদ্ধতি ভিন্ন। এটি তো বৈষম্য। শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাণিজ্যিকীকরণের অন্যতম প্রক্রিয়া? সরকারের এক্ষেত্রে কি করণীয় বলে আপনি মনে করেন?**

একটা কাজ ইতোমধ্যে সরকার করে ফেলেছে। সরকারি-বেসরকারি সব স্কুলে পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করার মাধ্যমে। মূলধারার শিক্ষা প্রদ্ধতির মধ্যে তারা চলে এসেছে। এবারের শিক্ষানীতিতে কিন্তু এ বিষয়টির প্রতিফলন আছে। এরপর আসবে অভিন্ন পাঠ্যসূচি প্রণয়নের ব্যাপারটি। অন্তত কিছু বিষয়ে অভিন্ন মান থাকতেই হবে। সরকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফি-এর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে সাহস করে না। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে আমরা সরকারি অনুদান নিচ্ছে যে স্কুলগুলো তাদের নির্দেশ দিয়েছিলাম কোনভাবেই পাঁচ হাজার টাকার বেশি ফি না নেয়ার জন্য। কিন্তু এটা এখন আর মানা হচ্ছে না। সরকার আবার সেই নীতি পুনঃপ্রবর্তন করার চেষ্টা করছে।

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের লাগাম টানা জরুরি। তবে ইতোমধ্যে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়াটা আমাদের অভিবাবক-শিশুদের প্রতি অন্যায় হবে। কিন্তু বৈষম্যটা কমিয়ে আনা সম্ভব। যেমন– সরকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোটা নির্ধারণ করে দিতে পারে। তাদের পড়াশুনা সম্পন্ন করার সব রকম দায়িত্ব ঐসব প্রতিষ্ঠানের। আমাদের সংবিধানে শিক্ষার অধিকারকে ফাণ্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল বলা হয়েছে। কাজেই এটি করতে হবে। ভারতে শিক্ষার অধিকার আইন (Right to Education) প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন হয়েছে। এর আওতায় সরকার সরকারি-বেসরকারি-বাণিজ্যিক সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতকরা ২০ শতাংশ কোটা সুবিধা-বঞ্চিত শিশুদের জন্য সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেছে। আমরাও এটি করতে পারি।

*ভারতে সামর্থ্যবান, যাদের শিশুরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়ে তারা একটা চার্জ (Surcharge) প্রদান করে সুবিধা-বঞ্চিত শিশুদের জন্য। এটা শিক্ষার জন্য একটি আলাদা তহবিল বা (Education Cess)। এর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার তহবিল সংগৃহীত হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা অর্থমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করবেন। আমাদের দেশেও অনেকে এধরনের বিনিয়োগ করতে চান। বর্তমানে জিডিপির ২.৪ ভাগ শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়। এর মাধ্যমে গেলে ৪-৬ ভাগ ব্যয় করলেও কোনো বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন হবে না।*

ভারতে সামর্থ্যবান যাদের শিশুরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়ে তারা একটা চার্জ (Surcharge) প্রদান করে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য। এটা শিক্ষার জন্য একটি আলাদা তহবিল বা Education Cess। এ বিষয়ে আমরা অর্থমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করবেন। ভারতে কোটি কোটি টাকার তহবিল এভাবে সংগৃহীত হয়েছে। আমরা অনেকের সাথে কথা বলে দেখেছি যারা এ ধরনের চর্চা বা বিনিয়োগ করতে চান। কিন্তু সরকারকে সেই স্বচ্ছতা এবং আস্থার জায়গা তৈরির দায়িত্ব নিতে হবে। মানব সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে। বর্তমানে জিডিপির ২ দশমিক ৪ শতাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়। এর মাধ্যমে গেলে ৪-৬ শতাংশ ব্যয় করলেও কোনো বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন হবে না।

**এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ। বেসরকারি অনেক সংগঠন মানুষের শিক্ষার অধিকার নিয়ে কাজ করলেও তাদের 'অভিন্ন শিক্ষানীতি প্রবর্তন আন্দোলন' এ মাঠে দেখা যায় না। এ বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখেন?**

এটা আংশিক সত্যি। এটার সাথে এক ধরনের দর্শন বা আদর্শের জায়গা আছে। আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি, ব্যক্তিগতভাবে পাঁচশ শিশুকে পড়ালে একটা সামাজিক স্বীকৃতি আছে বা ব্যক্তিগত লাভ আছে। কিন্তু সারা দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য 'অভিন্ন শিক্ষানীতি প্রবর্তন আন্দোলন'- এ মাঠে নামবে এমানসিকতার অভাব আছে। আমরা যারা শিক্ষা নিয়ে কাজ করছি তারা অধিকাংশই সেবা প্রদান (Service Delivery) করছি। চাহিদা বা অধিকার বাস্তবায়নের জায়গায় কাজ করার সংগঠন বাংলাদেশে কম আছে। কারণ এ দেশে এনজিও কার্যক্রম শুরুই হয়েছিল সেবা প্রদানে সরকারকে সহযোগিতা করার জায়গা থেকে। এর পাশাপাশি আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটিও আছে। প্রতিটি বেসরকারি সংগঠনকে নানা নিয়মের প্রতিবন্ধকতায় পড়তে হয়। তাই সেবা প্রদানের মতো কিছুটা নিরাপদ অবস্থান থেকে কাজ করতে চায়। রাস্তায় নেমে মিছিল-মিটিং বা যথাসময়ে বই পাওয়ার দাবিতে আন্দোলনে এনজিওগুলো যেতে চায় না। তবে সম্প্রতি কিছু সংগঠন এ্যাডভোকেসির মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। এ কাজটি স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু হতে হবে। একমাত্র বিকেন্দ্রীকরণই এর সমাধান হতে পারে।

**উন্নত বিশ্বে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে স্কুল জোনিং পদ্ধতি (Catch man Area) চালু আছে। আমাদের দেশের বাস্তবতায় এটি কতটুকু কার্যকর হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?**

আমি মনে করি, এটা আমাদের দেশেও করা

সম্ভব। কারণ আমরা যদি এ দেশে টিকাদান কার্যক্রম বাস্তবায়নে সফল হতে পারি, যদি এইচআইভির মতো নাজুক বিষয়ে কাজ করতে পারি তাহলে এটা নিয়েও পারি। প্রচারের জায়গাটিতে বেশি মনোযোগ দিতে হবে। তবে নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করার চেয়ে এলাকাভিত্তিক যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে আছে, সেগুলোর মানোন্নয়নে সরকারকে মনোযোগ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে, থাইল্যান্ডের একটি অভিজ্ঞতা আমরা নিতে পারি। সেখানে কোনো প্রতিষ্ঠানের ফল খারাপ হলে সেগুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ (Intensive Care) দেয়া হয় এবং বলা হয় I See You Next Year অর্থাৎ পরের বছর ভালো করার জন্য যেসব করণীয় আছে তা নিশ্চিত করা হয়। কাজেই কারো এমপিও বাতিল বা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে কোনো পরিবর্তন আমরা আনতে পারব না।

**আমাদের দেশে প্রতি বছর বন্যা, খরা, সিডরের মতো দুর্যোগ লেগেই আছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে শিশুরা বেশ কয়েক মাস শিক্ষা থেকে বিরত থাকে। ফলে তারা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং আয়মূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। এ কারণে অনেক শিশু ঝরে পড়ে। এমতাবস্থায় কি করণীয় বলে আপনি মনে করেন?**

এটি আমাদের দেশের আরেকটি কঠিন বাস্তবতা যেটির জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৮ সালে একটি প্রজ্ঞাপন দিয়েছিল Flexible School Calendar প্রবর্তনের। যেমন– বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কোনো স্কুল ১৫ দিন যদি বন্ধ তাহলে সেই ঘাটতি পূরণ হবে কীভাবে? এসময় যদি শিক্ষা বছরের ছুটিগুলো পুন:ব্যবস্থাপনা করা যায় তাহলেই সম্ভব। আবার দেখা যায়, পার্বত্য অঞ্চলে জুম চাষের সময় মানুষ খুব ব্যস্ত থাকে। তাদের তো রোজার দীর্ঘ ছুটির প্রয়োজন নেই। তাই মূল কথা হলো, এ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্থানীয়ভাবে ছেড়ে দিতে হবে।

**এডুকেশন ওয়াচ** (Education Watch) **১৯৯৯ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার নানা দিক তুলে ধরে প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর উল্লেখযোগ্য ফাইন্ডিং কি ছিল? প্রতিবেদন প্রকাশের পরবর্তী সময়ে সেই ফাইন্ডিংগুলো অর্জনে বা সমাধানে কীভাবে কাজ করেছেন? জাতীয় পর্যায়ে এগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কি না?**

এডুকেশন ওয়াচ (Education Watch) প্রতিবেদনের প্রকাশিত ১০টি সংখ্যায় কখনো প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা, শিক্ষার মানোন্নয়ন, সাক্ষরতার অবস্থা ইত্যাদি বিষয় ওঠে এসেছে। এগুলোতে মোটা দাগে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা, সম্ভাবনা এবং করণীয় বিষয়ে বেসরকারিভাবে একটি সার্বিক চিত্র উঠে এসেছে। বর্তমান শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি এডুকেশন ওয়াচ (Education Watch)- এর প্রতিটি সংখ্যা সংগ্রহ করেছে এবং বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক শতকরা ৮০ ভাগ সুপারিশ তারা বিবেচনা করেছে। ইউনেস্কো একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানেও তারা দেখিয়েছে, সরকার এডুকেশন ওয়াচের শতকরা ৬৫ থেকে ৭৫ ভাগ সুপারিশ আমলে নিয়েছে। আরেকটা হলো, এডুকেশন ওয়াচ তথ্য সংগ্রহের যে কাজটা করছিল তা এখন সরকার নিজ উদ্যোগে শুরু করেছে। আমরা মনে করি, এগুলোই আমাদের সাফল্য। এখন কথা হলো, আমলে নেয়া আর বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা এক বিষয় নয়। এখানে কিছু ঘাটতি আছে। আমরা সে জন্য এ্যাডভোকেসি করছি।

**'গণসাক্ষরতা অভিযান' প্রাথমিক শিক্ষা এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা আন্দোলনে দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করছে। এক্ষেত্রে আপনাদের বিশেষ অভিজ্ঞতার জায়গাগুলো কি? যা থেকে তৃণমূলে সাক্ষরতা ছড়িয়ে দিতে যেসকল সংগঠন কাজ করছে তারা দিক নির্দেশনা পেতে পারে?**

আমাদের পথ চলার দুই দশক পূর্ণ হতে চলেছে। সেই কাজের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি, যে মাধ্যমেই কাজ করি না কেন, মাঠ পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক তথ্য না থাকলে সরকার, দাতা সংস্থা বা অন্য কাউকেই হোক প্রভাবিত করা কষ্টকর। তখনই এডুকেশন ওয়াচের জন্ম। সেজন্য গবেষণা কাজটিকে আমরা গুরুত্ব দেই। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আরো দেখেছি, গবেষণা কার্যক্রম নিয়ে আমাদের নানা মতামত প্রচলিত রয়েছে। অনেকেই ভাবেন আমাদের বিশেষজ্ঞের অভাব রয়েছে। আপনাদের জন্য বলতে চাই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন গবেষক আমাদের দেশেই আছে। আমরা শিক্ষা বিষয়ে কাজ করছে এমন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের দক্ষতার উন্নয়নে এবং শিক্ষকদের মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকি। এগুলো করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, মানুষের মধ্যে ভালো কাজ করার চাহিদা আছে। এটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলেই অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যাবে। ◻

**সাক্ষাৎকার গ্রহণ :** সোমা দত্ত, নাগরিক উদ্যোগ

# ঔদ্ধত্যের কাছে মাথা নুইয়ে সমাজ চলতে পারে না

আমি আবারও আপত্তি জানাচ্ছি 'ইভ টিজিং' শব্দটি নিয়ে। পি-জ, আপনারা একটা জঘন্য অপরাধকে হালকা শব্দ দিয়ে উচ্চারণ করবেন না। এটা কোনোভাবেই হালকা বিষয় হতে পারে না। এটা তো যৌন নির্যাতন এবং যৌন হয়রানি। এর কোনো ক্ষমা নেই।

সাংবাদিকদের কাছেও আমার আরেকটি অনুরোধ আছে, শুধু একবার রিপোর্ট করে থেমে যাবেন না। এর গভীরে গিয়ে ফলোআপ করুন। ঘৃণ্য এঅপরাধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ঘরে-বাইরে নারী যেন চলতে পারে নির্ভয়ে। এর সাথে কারা জড়িত এ বিশে-ষণের প্রয়োজন রয়েছে। কেন ছেলেরা একটা অন্যায়কে মনে করবে এটা তাদের অধিকার! কেন তারা মনে করবে এটা করলে কিছু যায়-আসে না! তাদের শাস্তি দেয়ার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে এটা করলে রেহাই পাওয়া যাবে না। আমাদের কড়া নজর রাখতে হবে, ধরা পড়ার পর কোনো ক্ষমতাসীনরা তাদের প্রটেকশন দিচ্ছে? কারণ, ওই প্রশ্রয়ের কারণে তাদের বিচার হচ্ছে না, যে কারণে ঔদ্ধত্যেও বেড়ে যাচ্ছে। এমন ঔদ্ধত্যের কাছে মাথা নুইয়ে সমাজ চলতে পারে না। এটাকে এখনই দমন করা দরকার।

মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ দিতে হবে। আমাদের সমাজে প্রায়ই দেখি ছেলেমেয়েদের চলাফেরার ক্ষেত্রটিকে 'অর্টিফিশিয়াল' বা কৃত্রিম করে রাখি। এ ক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হচ্ছে, ফ্রি মিক্সিং হওয়া উচিত। এটা পরিবার থেকেই চর্চা করতে হবে। উত্ত্যক্তকারীদের অত্যাচারে স্কুলে যেতে পারলেও স্কুলের গণ্ডির মধ্যেও সে নিরাপদ নয়। বাড়িতে থেকেও নিরাপত্তা নেই। উত্ত্যক্তকারীদের উৎপাত সেখানেও বিস্তৃত। এ জন্য মেয়েদের ব্যাপক হারে বেরিয়ে আসার সুযোগ দিতে হবে। কেউ একজন উত্ত্যক্ত করল বলে মেয়েটির স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। এটা সামাজিক একটা মতাদর্শ হয়ে গেছে। এ কারণে সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য এখনো প্রকট আকারে রয়ে গেছে। অভিভাবকদের এসংস্কৃতি ভাঙতে হবে। মেয়েদের আরো সাহসী হতে হবে। প্রতিটি স্কুলে মেয়ে এবং ছেলেদের অভিযোগ শোনার জন্য সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে স্কুলের কমিটিতে রাখা উচিত। শিক্ষকদের এক্ষেত্রে আরো একটু দায়িত্ব নিতে হবে। আপনাদের কেবল পাঠদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগগুলো শুনতে হবে।

*মেয়েদের চলাফেরার পথ হোক নিরাপদ। কেন ছেলেরা একটা অন্যায়কে মনে করবে এটা তাদের অধিকার! কেন তারা মনে করবে এটা করলে কিছু যায়-আসে না! তাদের শাস্তি দেওয়ার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে এটা করলে রেহাই পাওয়া যাবে না। আমাদের কড়া নজর রাখতে হবে, ধরা পড়ার পর কোনো ক্ষমতাসীনরা তাদের প্রটেকশন দিচ্ছে?*

এসব হলো সামাজিক প্রতিরোধের কথা। কিন্তু ওই সব প্রতিরোধ তখনই কার্যকর হবে যখন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কঠোরভাবে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করবে। উত্ত্যক্তকারীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা করলে পুলিশকে তা গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখতে হবে। এ ব্যাপারে মানবাধিকার কর্মীসহ সমাজে আমরা যারা দায়িত্বশীল মানুষ আছি তারা যে যেখানেই থাকি না কেন তাদের এ ব্যাপারে কঠোরভাবে মনিটরিং করতে হবে ।

সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরও বিষয়টির ওপর আন্তরিকভাবে নজর রাখতে হবে। কেবল বক্তব্য দিয়েই দায়িত্ব শেষ, এটা ভাবা ঠিক হবে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোথাও কোথাও বখাটেদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনৈতিক দলের নাম আসছে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়েছে। নির্মম একেকটা মৃত্যুর পর কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের নজিরও আমাদের দেশে রয়েছে। কিন্তু অভাব রয়েছে ধারাবাহিক পদক্ষেপের। সে কারণে বন্ধ হচ্ছে না ভয়ঙ্কর এ প্রবণতা। এদিকে কঠোর নজরদারি দরকার। কারণ অব্যাহত পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে সমাজ, পরিবার-পরিজন কারো কাছ থেকে যথেষ্ট সহায়তা না পেয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী মেয়েরা বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যার পথ। যদিও এটা একমাত্র সমাধান নয়।

আমাদের গ্রামগুলোতে এখনো মুরব্বিদের কথা গুরুত্ব দেয়া হয়। তাদের সম্পৃক্তকরণের মধ্য দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় উঠান বৈঠকও করা

যেতে পারে। গ্রামের ক্লাব এবং বিভিন্ন সংগঠনের সোচ্চার হয়ে উৎপীড়কদের নানাভাবে লজ্জা দেয়া উচিত।

এর মধ্যে আমরা আটটি সংগঠনের প্রতিনিধি নাটোরে কলেজ শিক্ষক মিজানুর রহমান এবং ফরিদপুরে চাঁপা রানী ভৌমিকের হত্যাকারীদের বিচার দাবি করে চলমান আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে এবং অভিযুক্তদের আটক ও বিচারের মুখোমুখি করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক পদক্ষেপের অগ্রগতি জানতে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য, এলাকাবাসী, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সুপারিশগুলো দিয়েছি।

- মিজানুর রহমান ও চাঁপা রানী ভৌমিকের মৃত্যুকে দুর্ঘটনাজনিত হত্যাকাণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।
- চাঁপা রানী ভৌমিকের তিন শিক্ষার্থী মেয়ের সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যয় রাষ্ট্রীয়ভাবে বহন করা হোক।
- ভুক্তোভোগী পরিবারের নিরাপত্তার দিকে কঠোর নজর দেয়া হোক।
- ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের যৌন হয়রানি সংক্রান্ত ১০(২) ধারা যা ২০০৩ সাল রদ করা হয়। তা প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, পরিবর্ধনসহ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে পুনঃস্থাপন করা হোক।
- দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারার ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে সাজার পরিমাণ বৃদ্ধিসহ তা সংশোধন ও পরিবর্ধন করা হোক।
- সরকারের উদ্যোগে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে সচেতনতামূলক কার্যক্রম শুরু করা হোক।
- অপরাধীদের জীবন যাপন, পারিবারিক অবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি বিশে-ষণ করে তাদের সংশোধনে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। ▣

**ড. হামিদা হোসেন** : বিশিষ্ট মানবাধিকার এ্যাকটিভিস্ট

*অনুলিখন : শরীফা বুলবুল,*
*সূত্র : দৈনিক কালের কণ্ঠ*

# উত্ত্যক্তকরণ প্রতিরোধে জনমত গড়ে তোলা জরুরি

বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের পত্রিকাগুলোয় প্রকাশিত গত কয়েক মাসের খবর বিশে-ষণ করলে দেখা যায়, 'উত্ত্যক্তকরণ' বা 'ইভটিজিং' মহামারী আকার ধারণ করেছে। 'উত্ত্যক্ত' করা বা 'ইভটিজিং' আমাদের সমাজে নতুন কোনো ঘটনা নয়। বলা যায় এটা একটা বহু পুরনো সামাজিক ব্যধি। অনেকে হয়তো বলে থাকবেন, 'এটা তেমন দোষের কিছু নয়, উঠতি বয়সের চপলতা'। এমন হালকাভাবে দেখার প্রবণতা আমাদের সমাজের অনেকের মধ্যেই আছে। এধরনের অভিজ্ঞতা মেয়েদের জীবন যাপনের জন্য সুখকর নয়। 'উত্ত্যক্ত করা' বা 'ইভটিজিংয়ের' উৎপাত মেয়েদের সুস্থ স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ বিঘ্নিত করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এ ধরনের ঘটনার শিকার হয়ে মেয়েরা হীনম্মন্যতায় ভোগে, আত্মপ্রত্যয়ী হতে পারে না। লজ্জা অথবা লোক নিন্দার ভয়ে মেয়েরা নীরবে যুগ যুগ ধরে এটা সহ্য করে এসেছে, উত্ত্যক্ত হয়েও প্রতিবাদ করতে না পারায় মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করেছে। পরিবার থেকেও কোনো সমর্থন সহযোগিতা না পেয়ে নিরুপায় হয়ে কখনো কখনো আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে 'মুক্তি' পেতে চেয়েছে।

সমাজতাত্ত্বিক K. Sacks এবং E Leacock এপ্রসঙ্গে বলেন, 'নারী নির্যাতন, নারী উত্ত্যক্তকরণ ও নারী অসমতার মূল বা শিকড় ঐতিহাসিকভাবেই আমাদের সমাজ ব্যবস্থার অনেক গভীরে লুকিয়ে আছে।' নারীবাদী তাত্ত্বিকরা আমাদের সমাজের সামাজিক পরিমণ্ডলে এধরনের অসমতার কারণ হিসাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী করেন। তবে কোনো একক কারণ থেকে এর জন্ম হয়নি বরং এর সাথে বিভিন্ন জটিল বিষয় জড়িত যার মধ্যে আন্তঃসম্পর্কিত হয়ে আছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার উন্মেষ, উপনিবেশবাদ এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মতো বিষয়গুলি।

গত কয়েক বছরে উত্ত্যক্তকরণের শিকার হয়ে অনেক মেয়ের আত্মহত্যার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়েছে। উত্ত্যক্ত করার ফলে অপমৃত্যুর ঘটনা ঘটলে সেটি নিয়ে কিছুটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, হইচই হয়। কিন্তু খেদের বিষয়টি হচ্ছে এ ধরনের ঘটনা প্রতিকারের জন্য আইনি বিধান থাকলেও তার প্রয়োগের পথে তেমন কোনো অগ্রগতি এখনো পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। এ কারণে এখনো এ ধরনের ঘটনার নজির আমরা হরহামেশাই দেখতে পাচ্ছি। এ রকমই একটা ঘটনার অংশ বিশেষ নিচে তুলে ধরছি-

*'শিক্ষকের বাসা থেকে প্রাইভেট পড়ে বাড়ি ফিরছিল ফরিদপুরের চরভদ্রাসনের দরিদ্র পরিবারের মেয়ে রূপা। পথে পাড়ার সাত যুবক তাকে ধরে নিয়ে যায়। গণধর্ষণ করে। এরপর রাত ২টার দিকে তাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে ছেড়ে দেয়। পরদিন সে জেলা প্রশাসাসক, চেয়ারম্যান, সবার কাছে ওই যুবকদের নাম জানিয়ে বিচার প্রার্থনা করে। চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় ক্ষমতাসীনরা উল্টো ওই যুবকদেরই পক্ষ নেয়। সবাই মিলে মেয়েটিকে পাগল ও পতিতা অপবাদ দেয়। তারা মেয়েটির মা-বাবাকে হুমকি দেয় এ বলে, বাড়াবাড়ি করলে মেয়েটির ছোট বোনকেও ধর্ষণ করা হবে। ১৭ দিন অসুস্থ থাকার পর রূপা মারা যায়।' সূত্র: ৯ ডিসেম্বর ২০১০, 'দৈনিক প্রথম আলো'*

এ রকম তো প্রতিদিনই দেখছি। গত ৯ ডিসেম্বর ২০১০ 'প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা গেল, ২০১০ সালের প্রথম ৬ মাসে এক হাজার ৫৮৬ নারী ধর্ষিত হয়েছেন। শুধু যৌতুকের কারণে খুন হয়েছেন ১০০ নারী। ইভটিজিংয়ের শিকার

হয়ে আত্মহত্যা করেছে ২২ তরুণীসহ ২৬ নারী। লাঞ্ছনা ও উত্ত্যক্ততার প্রতিবাদ করায় ২ নভেম্বর পর্যন্ত খুন হয়েছেন ১২ যাদের মধ্যে আছেন ৫০ বছরের বৃদ্ধ মা এবং কলেজ শিক্ষক। এক পিতা আত্মহত্যা করেছেন। লাঞ্ছিত হয়েছেন ২৪৩, যাদের ১৭৭ নারী।

গত ৯ ডিসেম্বর ২০১০ ছিল বেগম রোকেয়ার জন্ম ও মৃত্যুদিবস। প্রতিবারের মতো এবারও দেশের রাষ্ট্রনেতারা এ দিবস কেন্দ্র করে বাণী দিয়েছেন, অনেক আলোচনা হয়েছে, অনুষ্ঠান হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানেও এ দেশের অসংখ্য নারীর জীবনের অকাল পরিসমাপ্তিতে হা-হুতাশ করেই সামাজিক দায়িত্ব শেষ করা হয়েছে। অথচ অসংখ্য মেয়ের মৃত্যুর কারণ হওয়া সত্ত্বেও 'উত্ত্যক্তকরণ' বা 'ইভটিজিং' কে যৌন হয়রানির মতো একটি গুরুতর অপরাধ বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। উল্টো উত্ত্যক্তকারীদের বখাটে বলে উলে-খ করে যেন এক ধরনের প্রশ্রয়ই দেয়া হয়েছে।

'ইভটিজিং' বা 'উত্ত্যক্ত করা' নামের ভয়ঙ্কর যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে কঠোর কোনো আইন না থাকায় তাদের সন্ত্রাসী-দুর্বৃত্ত হিসেবে চিহ্নিত করে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকরাও এ বিষয়ে মেয়েদেরই দোষারোপ করে নিরাপত্তাহীনতার অজুহাতে মেয়েকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দায় সারেন। ফলে শিক্ষা থেকে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার প্রতিনিয়ত বাড়ে, বাড়ে বাল্যবিয়ের সংখ্যা। এর জন্য দায়ী কে? রাষ্ট্রীয় রীতি-নীতি না পুরুষতন্ত্রের ভয়ঙ্কর উন্মত্ত উল্লম্ফন? আজ থেকে শত বছর আগে বেগম রোকেয়া লিখেছিলেন–

'আমি আজ ২২ বৎসর হইতে ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। কাহারা, জানেন? সে জীব ভারত-নারী! এজীবগুলির জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্য জাতির দুঃখে বিচলিত হইয়াছেন; স্বয়ং থার্ড ক্লাশ গাড়িতে ভ্রমণ করিয়া দরিদ্র রেল-পথিকদের কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধবন্দিনী নারীজাতির জন্য কাঁদিবার একটি লোকও এ ভূ-ভারতে নাই' (বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি : সভানেত্রীর ভাষণ, বেগম রোকেয়া রচনাবলি, উত্তরণ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২০৩)

এপুরুষতন্ত্রের নগ্ন আরেক প্রকাশ নারীর ওপর যৌন নিপীড়ন। সমাজতাত্ত্বিক Wise Ges Stanley বলেছেন, 'যৌন হয়রানি হচ্ছে পুরুষ আধিপত্যকে আরো জোরালো করার জন্য পৌরুষের ব্যবহার।' তিনি আরো বলেন, 'যৌন হয়রানির অন্যতম উদ্দেশ্য নারীকে পুরুষের খেয়ালখুশির পণ্যে পরিণত করা এবং তাদের অহংবোধ বাড়ানো।'

*পুরুষতন্ত্রের নগ্ন প্রকাশ নারীর উপর যৌন নিপীড়ন। সমাজতাত্ত্বিক Wise Ges Stanley বলেছেন, 'যৌন হয়রানি হচ্ছে পুরুষ আধিপত্যকে আরো জোরালো করার জন্য পৌরুষের ব্যবহার।' তিনি আরো বলেন, 'যৌন হয়রানির অন্যতম উদ্দেশ্য নারীকে পুরুষের খেয়ালখুশির পণ্যে পরিণত করা এবং তাদের অহংবোধ বাড়ানো।' যে কারণে এখনো আমাদের সমাজে যৌন হয়রানির ঘটনায় নারীর কাঁধেই অপরাধের দায়িত্ব চাপিয়ে পরিতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করা হয়।*

এ কারণেই এখনো আমাদের সমাজে যৌন হয়রানির ঘটনায় নারীর কাঁধেই অপরাধের দায়িত্ব চাপিয়ে পরিতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করা হয়। রূপার ঘটনাটি পত্রিকায় প্রকাশ হওয়ার পর আমার এক পুরুষ সহপাঠীর (কায়ছার, ২৫) সাথে আলাপ করি। সে এঘটনা শুনে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না, উপরন্তু বলল, *'এসব ঘটনায় তোরা শুধু একতরফা ছেলেদের দোষ দেখিস। মেয়েদেরও দোষ আছে'। এখনকার মেয়েরা যেসব পোশাক পরে, যেসব ভাবভঙ্গি করে তাতে তো এসব ঘটবেই!'*

*এ কথা শুনেই* বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে যায়। পরক্ষণেই মনে হয়, কায়ছারের বক্তব্য আমাদের সমাজের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত বক্তব্যের বাইরের কিছু নয়। এ বিষয়ে বেগম রোকেয়ার 'ভ্রাতা-ভগ্নি' গল্পের কথা মনে পড়ে। সেখানে কাজেব ও সিদ্দিকা দুই ভাইবোনের মধ্যে যুক্তি-তর্ক হচ্ছে–

*কাজেব : দুষ্কর্মে স্ত্রীলোকের হাত প্রকাশ্যে না থাকুক, মূলে তাহারা থাকে। স্বর্গোদ্যানে তোমরাই আমাদের পতনের পথপ্রদর্শক ছিলে। ট্রয় সময়ের তোমরাই নায়িকা ছিলে। লঙ্কাকাণ্ডে তোমরাই অভিনেত্রী ছিলে।*

*সিদ্দিকা : হ্যাঁ, মাবিয়ার কন্যার সহিত হযরত আলীর কন্যার যুদ্ধ হইয়া ছিল! আর সেনাপতি ছিলেন হযরত শহরবানু!*

*কাজেব : স্ত্রীলোক যে আনরিজনেবল (যুক্তিজ্ঞানহীনা) ইহা তাহাদের প্রকৃতি। তোমরা প্রতি কথায় যুক্তিহীনতার পরিচয় দাও! পুরুষ জাতি স্বভাবতই যুক্তি, শক্তি বিশিষ্ট।*

*সিদ্দিকা : ঠিক! তাই লঙ্কাকাণ্ডে সীতাদেবীকে অভিনেত্রী বলিয়া তুমি হঠাৎ সমস্ত যুক্তি, শক্তি ব্যয় করিয়া ফেলিলে! ভাই! একটা উদাহরণ শুন। আমার হাঁপানি রোগ আছে, ডাক্তার আমাকে কলা খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু মর্ত্তমান কলা দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আমি গোটা কতক কলার শ্রাদ্ধ করিলাম, অতঃপর আমার হাঁপানি বৃদ্ধি হইল! এখন বলত, হাঁপানি বৃদ্ধির জন্য কে দোষী হইবে? আমি, না কলা?*

*কাজেব : তুমি দোষী হইবে। কারণ লোভ সংবরণ করিতে পারো নাই।*

*সিদ্দিকা : দোহাই তোমার যুক্তি– সব দোষ কলার ! কারণ, কলা সীতাদেবী, সুফিয়া, রাবণ। ভাইয়া! তোমার যুক্তির বলিহারী যাই! (ভ্রাতা-ভগ্নী, পূর্বোক্ত;পৃ: ৩৭৬)*

রোকেয়ার সময় থেকে আমরা অনেক কাল অতিক্রম করেছি। তবুও এধরনের ঘটনার নজির আমাদের মনে করিয়ে দেয় বেগম রোকেয়ার নারী মুক্তির কথা ও আমাদের বিদ্যমান সামাজিক বাস্তবতার কথা। নারী মুক্তি বা নারী স্বাধীনতা যাই বলি না কেন তার সুষ্ঠ বাস্তবায়ন না করা গেলে দেশের সার্বিক অগ্রগতি কখনই সম্ভব নয়, উত্ত্যক্ত করার বা এর শিকার হওয়ার সার্বিক ক্ষতি আমাদের সবার। আসুন এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলি। সেই সাথে সরকারের কাছে এর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট আইনি নির্দেশনা প্রণয়ন ও তার যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থাপত্র গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি। ◻

**ওয়াজিহা রহমান** : নাগরিক উদ্যোগ

# সহস্রাব্দ উন্নয়ন অঙ্গীকার
# মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিস্থিতি

২০০০ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে আয়োজিত সহস্রাব্দ সম্মেলনে গোটা বিশ্বের জন্য টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মোট ৮টি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে ইতিমধ্যে দশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং বলা বাহুল্য, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা সফলতাও অর্জন করেছি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এ সফলতা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেয়া সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে লক্ষ্য ৪ ও ৫ তথা শিশু মৃত্যুরোধ ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন– এ দুটি ক্ষেত্রে অগ্রগতি তেমন হয়নি। এবিষয় দুটির অগ্রগতি এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো কি কি তা খুঁজে বের করার লক্ষ্যে সম্প্রতি ইউএন মিলেনিয়াম ক্যাম্পেইন- এর সহায়তায় মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও পপুলেশন সার্ভিসেস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি) যৌথভাবে একটি বিশেষ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। একাজটি করতে দেশের সমতল, হাওর-বাঁওড়, পাহাড়ি, সীমান্তবর্তী এবং উপকূলবর্তী এলাকা থেকে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য পাঁচটি বিভাগের ছয়টি জেলার মোট ৭টি উপজেলা ও ৫০টি ইউনিয়ন নমুনা এলাকা হিসেবে নির্বাচিত হয়। এখান থেকে এবং স্থানীয় পর্যায়ে সেবা গ্রহণকারী সাধারণ মানুষ ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারীদের সংগঠন (ক্লায়েন্ট এসোসিয়েশন)- এর কাছ থেকে দুটি ভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপকৃত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ থেকে দেখেছি-

- প্রায় ৯০% শিশু টিকার আওতায় এলেও এখনো নিউমোনিয়া, ডায়ারিয়া এবং অপুষ্টি ইত্যাদি প্রতিরোধযোগ্য অসুখ শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ।
- গর্ভবতী নারীদের প্রায় অর্ধেক গর্ভকালীন সেবার আওয়ায় এসেছে যদিও মাত্র এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রসবকালীন দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি হচ্ছে।
- অপরিণত বয়সে (১৮ বছরের নীচে) গর্ভধারণ মাতৃমৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে যা প্রায় ৮০% এর কাছাকাছি।
- কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা এবং এ সংক্রান্ত- সচেতনতা নেই বললেই চলে (এক্ষেত্রে শতকরা হার মাত্র ১-২%)।
- সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো বিরাট সংখ্যক জনবলের ঘাটতি রয়েছে যা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে-ক্সের ক্ষেত্রে- চিকিৎসক ৭০%, সুপারভাইজার ৬০% এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ১০-৬০% পর্যন্ত)।
- ঔষধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের বিরাট ঘাটতির ফলে সেবা কার্যক্রম ব্যবহত হচ্ছে।
- দরিদ্র্য, অবহেলা, সর্বসাধারণের প্রবেশগম্যতায় বাধা এবং মানসম্মত চিকিৎসা সেবা না থাকা মৃত্যু ও স্বাস্থ্য সমস্যার অন্যতম কারণ।

মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং এর সাথে সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য। যা ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায় থেকে আমরা পেয়েছি তাতে করে লক্ষ্য অর্জনের পথে আমারা যে অনেকটাই পিছিয়ে আছি তা স্পষ্ট। এছাড়া সরকারিভাবে চলমান যেসব প্রচেষ্টা তাও নির্ধারিত সময়ে লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে নিয়োজিত দক্ষ-অভিজ্ঞ কর্মীদের অনেকেই চাকরি থেকে অবসরে গেলেও শূন্য পদে লোক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। যদিও সম্প্রতি সরকার দু'একটি পদে কিছু জনবল এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে এমবিবিএস চিকিৎসক অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়েছে, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো চালু করা হয়েছে তবুও নির্ধারিত সময়ে লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আরো বহুদুর যেতে হবে বৈকি।

সারা দেশে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রায় চার সহস্রাধিক মানুষ গ্রামীণ জনপদে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা, জনবলের ঘাটতি, দায়িত্বরত কর্মীদের দায়দায়িত্ব, স্থানীয় মানুষের করণীয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সার্বিক অবস্থা, বরাদ্দকৃত ঔষধ ও উপকরণ, মা ও শিশু-মৃত্যুর কারণ এবং প্রতিরোধের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন।

### মা ও শিশু স্বাস্থ্যের লক্ষ্য অর্জন : বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

মা ও শিশু স্বাস্থ্যের জন্য লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ সেবা গ্রহণকারী ও সেবা প্রদানকারী উভয় পক্ষই চিহ্নিত করেছেন। মাঠ পর্যায় থেকে উঠে আসা চ্যলেঞ্জগুলো ছিল এমন–

- জনসংখ্যা, ভৌগোলিক বিস্তৃতি এবং চাহিদা

| বিষয় | স্থানীয় পর্যায়ে অর্জনের শতকরা হার |
|---|---|
| নারীদের টি টি টিকা গ্রহণ | ৯০% |
| প্রসব-পূর্ব চিকিৎসক অথবা স্বাস্থ্যকর্মী সেবা গ্রহণ (অন্তত একবার) | ৫১.৫৩% |
| স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সন্তান প্রসব | ১০.৬১% |
| স্বাস্থ্যকর্মী/নার্স/ডাক্তারের উপস্থিতিতে বাড়িতে সন্তান প্রসব | ২৬.১৪% |
| স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের কাছে প্রসব-পরবর্তী সেবা গ্রহণ | ৪০.০৩% |
| স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের কাছে থেকে নবজাতকের সেবা গ্রহণ | ৪০.৯৫% |
| শিশুদের টিকা গ্রহণ (বিসিজি, ডিপিটি ও পোলিও'র প্রথম ডোজ) | ৮৯.২৩% |
| হামের টিকা | ৮৮.০৮% |
| ভিটামিন-এ ক্যাপসুল বিতরণ | ৮৮.৯৩% |
| জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ ব্যবহারের হার | ৬৮.৭১% |
| প্রসবকালীন জটিলতা নিরূপণ এবং উচ্চ পর্যায়ে রেফার | ৭.৭৫% |
| কৈশোরকালীন সেবা গ্রহণ | ১.৫% |

অনুযায়ী সেবা নিশ্চিত করার মতো জনবল কোনো কেন্দ্রেই নেই। এমনকি অনেক কেন্দ্রে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যকর্মীর (উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা) অনুপস্থিতিতেই চলছে সেবা কার্যক্রম।

- অধিকাংশ ইউনিয়নের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো ইউনিয়নের একপ্রান্তে অবস্থিত। ফলে মহিলা ও শিশুদের সেবা নিতে আসা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা তেমন নেই, বিশেষ করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যগুলো।
- জনগণের জন্য উন্মুক্ত স্থানে প্রদর্শনের তথ্য যেমন– মনিটরিং বোর্ড, ঔষধের হালনাগাদ তালিকা এবং প্রশিক্ষিত দক্ষ ধাত্রীর তালিকা কিছু কেন্দ্রে পাওয়া গেলেও তথ্য হালনাগাদ নেই।
- ঔষধের চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ একেবারেই কম। ঔষধ না দিয়ে বিক্রি করার অভিযোগও পাওয়া যাচ্ছে।
- সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে কি কি সেবা, ঔষধ ইত্যাদি বিনামূল্যে দেয়া হয় সে সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করা গেছে।
- ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের কোনো ধারণা নেই। যদিও সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বলছেন, তাদের কমিটি কার্যকর রয়েছে।
- গর্ভবতী সেবা (এএনসি), গর্ভ-উত্তর সেবা গ্রহণের হার এখনো খুবই কম এবং প্রশিক্ষণবিহীন অদক্ষ ধাত্রীর হাতে সন্তান হার এখনো বেশি।
- ইপিআই এবং হামের টিকা প্রদানের হার কোথাও ১০০% অর্জন করা সম্ভব হয়নি এবং বয়ঃসন্ধিকালীন (কৈশোর প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা) সেবার হার ২%- এর নিচে।
- গ্রামীণ জনপদে শিশু-মৃত্যুর কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে নিউমোনিয়া, পানিতে ডুবে মৃত্যু, অপুষ্টি, গর্ভ এবং প্রসবকালীন জটিলতা হতে সৃষ্ট অসুস্থতা, অসচেতনতা, অজ্ঞতা, সময়মতো ডাক্তারের কাছে না যাওয়া, অর্থনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি।
- মাতৃমৃত্যুর কারণ হিসেবেও বাল্যবিয়ে, অল্প বয়সে গর্ভধারণ, গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন জটিলতা, অদক্ষ ও প্রশিক্ষণহীন স্থানীয় ধাত্রীর হাতে প্রসব করানো, দীর্ঘ মেয়াদি মারাত্মক অপুষ্টি, UHFWC-তে আধুনিক যন্ত্রপাতি না থাকা, শিক্ষার অভাব, অসচেতনতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ইত্যাদি প্রধান কারণ।
- জাতীয় পর্যায়ে প্রতি FWA ৫০০ দম্পতিকে এবং প্রতি HA ৬০০০ জনকে সেবা প্রদান মানসম্মত ধরা হয় সেখানে প্রায় প্রতি ইউনিয়নে দ্বিগুণেরও বেশি মানুষকে সেবা দিতে হচ্ছে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ের স্যাটেলাইট ক্লিনিক নিয়মিত পরিচালিত হয় না।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন একটি জাতীয় অগ্রাধিকার হলেও যারা এলক্ষ্য অর্জনে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছেন তাদের এ বিষয়ে ধারণা একেবারে নেই বললেই চলে।

এছাড়া চিহ্নিত চ্যালেঞ্জগুলো বিশে-ষণ করলে এর অন্তর্নিহিত অনেক কারণ বেরিয়ে আসে। যেমন– মা ও শিশু-মৃত্যুর যেসব কারণ আমরা পেয়েছি তার পশ্চাতে রয়েছে নানা সামাজিক অসঙ্গতি, অশিক্ষা, কুসংস্কার, নেতিবাচকক দৃষ্টিভঙ্গি, নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা ইত্যাদি। অল্প বয়সে বিয়ে এবং অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ, গর্ভকালীন সেবার নিম্ন হার, নবজাতকের সেবার নিম্ন হার, কৈশোরকালীন সেবার প্রতি গুরুত্বহীনতা ও নিম্ন হার এবং প্রসবকালীন সময়ে দক্ষ ধাত্রী/নার্স/ডাক্তারের উপস্থিতির নিম্ন হার নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ইত্যাদি।

## অগ্রাধিকার ভিত্তিক কার্যক্রম নির্ধারণ

শিশু ও মাতৃ-স্বাস্থ্যের লক্ষ্য অর্জনে কি করা যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে কার কি ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে গণশুনানিতে বিস্তারিত আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত কার্যক্রম বা উদ্যোগ বাস্তবায়নের সুপারিশ এসেছে– যা এখানে উলে-খ করা হলো

### জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য

- সেবা প্রদানকারী ইউনিট হিসেবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য যে জনবল কাঠামো তা পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করতে সব শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করা।
- প্রয়োজনীয় জনবলসহ কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো চালু করা।
- প্রয়োজনমত ঔষধ সরবরাহ করা ও অন্যান্য চিকিৎসা উপকরণ নিশ্চিত করা।
- স্বাস্থ্যসেবার সাথে যুক্ত সব পর্যায়ের কর্মীদের আধুনিক ও মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসব-উত্তর সেবার হার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেয়ার লক্ষ্যে ইউনিয়নে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

- সুপারভিশন ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা।

**স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য**

- নিয়মিত ও নির্ধারিত সময় পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো খোলা রাখা।
- ইউনিয়ন ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কমিটি গঠন ও কার্যকর করা।
- কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব এবং নির্ধারিত সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাউন্সিলিং, স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রম শুধু সেবাকেন্দ্র ভিত্তিক না রেখে কমিউনিটির মধ্যে নিয়ে যাওয়া।
- ইউনিয়নের স্যাটেলাইট ক্লিনিকগুলো নিয়মিতভাবে আয়োজন করা।
- মা ও শিশুদের সুবিধার্থে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সুপেয় পানি, বসার ব্যবস্থা করা।
- হাওড়-বাঁওড়, পাহাড়ি ও উপকূলবর্তী এলাকার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া।

**অন্যান্য উদ্যোগ (এনজিও, সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে)**

- গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা।
- নারী ও শিশুর প্রতি পরিবার ও সমাজে বিদ্যমান নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্ধারিত সেবা প্রদানের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম যেমন– সভা, র‍্যালি, দিবস পালন, সাধারণ আলোচনা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

এমডিজির লক্ষ্য অর্জনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো কাজ করে যাচ্ছে। ইউনিয়ন তথা গ্রামীণ জনপদে স্বাস্থ্যচিত্রের যে বিদ্যমান অবস্থা তা কিছুটা অনগ্রগতির ইঙ্গিত দিলেও এখানে থেমে থাকার অবকাশ নেই। ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে এখান থেকে আমাদের অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। যারা সেবা দিচ্ছেন এবং যারা সেবা গ্রহণকারী এবং ভুক্তভোগী তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে বেশকিছু সুপারিশ করেছেন। যা সমস্যা সমাধানে সম্ভাব্য উপায় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ▣

**মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম নয়ন :** উন্নয়নকর্মী

# প্রসঙ্গ সংবিধান সংশোধন

## বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠী

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে সংবিধান সংশোধন প্রসঙ্গটি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সংবাদ মাধ্যমগুলো এ বিষয়ক খবর-মতামত-বিশে-ষণে ভরে যায়। আর একই সময়ে উচ্চ আদালতের দুটি রায় এ আলোচনাকে আরেকটু ত্বরান্বিত করে। সংবিধান সংশোধনী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে যে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে এবং হচ্ছে সেদিকে না গিয়ে এ নিবন্ধে সংবিধান সংশোধনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটি বিশাল জনগোষ্ঠী কীভাবে আড়াল হয়ে যায় এবং রাষ্ট্র ও সংবিধানের কাছে সেই জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশার দিকটিতে নজর দেয়া হবে।

সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি সামনে আসার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের অবস্থান ও মতামত ব্যক্ত করেছে। জনগোষ্ঠী হিসেবে আদিবাসীরা সংবিধানে তাদের স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছে যা স্বাধীনতার পর থেকেই তারা জানিয়ে আসছিলেন। তৎকালীন আদিবাসী নেতা এম এন লারমা সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে ১৯৭২ সালে গণপরিষদ অধিবেশন থেকে ওয়াকআউটও করেছিলেন। দীর্ঘ দিনের লড়াই-সংগ্রামের কারণে আদিবাসীদের এই দাবিটি রাজনৈতিকভাবে ওয়াকিবহাল মহলে পরিচিত হলেও 'প্রধান' রাজনৈতিক দলগুলোর এজেন্ডাভুক্ত হতে পারেনি। এমনকি জনগণের মধ্যে সংবিধান সংশোধন বিষয়ক যে আলাপধারা তৈরি হয়েছিল সেখানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দাবি মূলধারায় স্থান করে নিতে পারেনি এখনো। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় একটি জনগোষ্ঠীর যখন এঅবস্থা, তখন জন্ম ও পেশাভিত্তিক বৈষম্যের শিকার এবং সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত-বঞ্চিত দলিত জনগোষ্ঠীর অবস্থা কী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

**দলিত : মনোযোগের আড়ালে যে জনগোষ্ঠী**

কানপুরি, তেলেগু, ঋষি, কাওরা, বেঁদে, রবিদাস, মুন্ডা, পৌন্ড্র, চাশ্রমিক, নিকারি, শিকারিসহ প্রায় শতাধিক জাতিগোষ্ঠী পরিচয়ে এ দেশে প্রায় ৫৫ লাখ দলিত মানুষ বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলে বাস করছে। শুধু জন্ম

ও পেশাগত পরিচয়ের কারণে এজনগোষ্ঠী বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার এবং সামাজিকভাবে স্বীকৃত তথাকথিত কিছু নিচু পেশা গ্রহণে বাধ্য হয়। বাংলাদেশে দলিতরাই সম্ভবত সবচেয়ে প্রান্তিক অবস্থানে থাকা মানুষ। জাতিগোষ্ঠী, বর্ণ, গাত্রবর্ণ, ধর্ম, ভাষা, সামাজিক উৎসের ভিত্তিতে আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে এ জনগোষ্ঠী বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার।

বিশাল এজনগোষ্ঠী এ দেশে সুইপার, চা-শ্রমিক, মুচি, ধোপা, ডোম, মেথর ইত্যাদি পেশায় সেবা শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। বিনিময়ে তারা পেয়েছে দারিদ্র্য ও অচ্ছ্যুৎ পরিচয়। তাদের প্রতি অবজ্ঞা আর বঞ্চনা যেন 'স্বাভাবিক' ও স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার। এযখন অবস্থা, তখন সংবিধান সংশোধনের মতো একটি 'উচ্চ পর্যায়ের' আলোচনায় অংশগ্রহণ ও তার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ দলিতদের কোথায়? তারা নিজেরা যেমন এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে পারেনি, সমাজের 'মূলধারা' সংবিধান সংশোধন বিষয়ক আলোচনার মধ্যে তাদের আনেনি। ফলে সংবিধান সংশোধন বিষয়ক আলাপধারা থেকে দলিত জনগোষ্ঠী ছিটকে পড়লো। যেমনটি রাষ্ট্রের অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বেলায়ও ঘটে থাকে।

**সংকট কোথায়?**

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত আমাদের সংবিধানের ২৭, ২৮ (১), (৩), (৪) ও ২৯ (১), (২), (৩) ধারায় চেতনাগতভাবে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কারো প্রতি বৈষম্য করা যাবে না বলে আলোকপাত করা হলেও প্রায়োগিকভাবে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকার কারণে সমাজে এজনগোষ্ঠী উপরোক্ত পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পায় না। তবুও, সমাজে এজনগোষ্ঠী মূলধারার মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পায় না এবং 'অপর' হিসেবে গণ্য হয়। এপরিস্থিতিতে অস্পৃশ্যতা ও সামাজিক বৈষম্যবিরোধী কোনো আইন না থাকায় অস্পৃশ্যতার প্রতিকার চেয়ে এজনগোষ্ঠী আদালতের কাছে আবেদন করতেও পারে না। ফলে, পেশা ও জন্মের ভিত্তিতে সামাজিক বৈষম্য-বঞ্চনা ও অস্পৃশ্যতা বিদ্যমান থাকছে। যা দারিদ্র্যকে ত্বরান্বিত করাসহ রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে।

এখানে উলে-খ্য, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের ১৮.১ ধারায় বলা হয়েছে, "....সংখ্যালঘু, আদিবাসী, ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠী এবং দলিতদের প্রতি বৈষম্যমূলক সব প্রকার আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করা হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের জন্য চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।" এ রকম ঘোষণা দিয়ে বর্তমান সরকার যখন ক্ষমতায় আসীন হয় তখন এ জনগোষ্ঠী বিশাল স্বপ্নে বুক বেঁধেছিল যে, সংবিধানের ২৮ (৪) ধারা *['নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত করিবে না]* মোতাবেক সরকার হয়তো বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। কিন্তু করেনি।

এঅবস্থায় রাষ্ট্র ও সমাজের সুষম বিকাশ ও উন্নয়ন এবং সামাজিক সংহতির প্রয়োজনেই 'পিছিয়ে পড়া' বা 'অনগ্রসর অংশ' ধারণার বাইরে জন্ম ও পেশার ভিত্তিতে বিদ্যমান বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার জনগোষ্ঠীর নাগরিক অধিকার, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বিশেষ ধারা সংযোজন এবং প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

**কেন বিশেষ ধারা যুক্ত করার কথা বলছি?**

পাঠক নিশ্চয়ই একমত হবেন, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ উত্তর বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় যে কটি রাষ্ট্র যাত্রা শুরু করেছিল, তার মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব জাতিগোষ্ঠীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল এবং আমাদের সংবিধানের উলি-খিত ধারাগুলোর মূল চেতনা তাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং সামাজিক চর্চায় রাষ্ট্রের মূল চেতনা প্রবেশের পথ বার বার বাধাগ্রস্ত হওয়ায় জন্ম ও পেশাগত পরিচয়ভিত্তিক বৈষম্য নির্মূলের কোনো উদ্যোগ রাষ্ট্রের কৌশল বা নীতি গ্রহণের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

আমাদের মহান সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকার অংশে ২৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে, *'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।'* কিন্তু সামাজিক বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা বিরোধী কোনো আইন যদি প্রণীত না হয়। তাহলে এজনগোষ্ঠী কোনো আইনবলে প্রমাণ করবে, সে বৈষম্যের শিকার এবং তা থেকে তার পরিত্রাণের অধিকার আছে?

২৮ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, *'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।'* কিন্তু রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন না করলেও রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমাজ যখন জন্ম ও পেশাগত পরিচয়ের কারণে কোনো মানুষকে অচ্ছ্যুৎ করে এবং তার প্রতি বৈষম্য করে, রাষ্ট্র তখন অচ্ছ্যুৎ এবং বৈষম্যের শিকার মানুষকে রক্ষা করবে কী দিয়ে?

২৮ (৩) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, *'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।'* কিন্তু স্কুলে, সামাজিক বা বিনোদনের কোনো স্থানে কাউকে যদি বৈষম্যের শিকার হতে হয়, বিশেষ করে সামাজিক চর্চার কারণে তাহলে সে কীভাবে প্রতিকার চাইবে?

**শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈষম্য**

গত ৩ এপ্রিল ২০১০ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যায়, যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার ভোজগাতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্য শিক্ষকরা স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান থেকে দলিত সম্প্রদায়ের ৭০ জন শিক্ষার্থীকে বের করে দেয়। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক বলেন, 'তোরা ছোট জাতের লোক। এত বড় অনুষ্ঠানে তোদের মানায় না। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এ অনুষ্ঠানে অতিথি থাকবেন। তোরা এ অনুষ্ঠান থেকে বের হয়ে যা।' রাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠানেই যদি এ অবস্থা হয় তাহলে গ্রামীণ সমাজ, বিশেষ করে যেসব প্রত্যন্ত এলাকায় রাষ্ট্র বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

চেতনাগত দিক থেকে আমাদের সংবিধান নিশ্চিতভাবেই সব নাগরিকের সমান অধিকার ও সুযোগের কথা বলেছে। কিন্তু যে জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিক নানা প্রতিকূলতার কারণে আইনের আশ্রয় লাভ করা যায়– এধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেনি। যে জনগোষ্ঠী সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনার যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়ার কারণে নিজেদের নাগরিক বলে

বিশ্বাস করতে পারে না তারা কি করে রক্ষা পাবে, তার জন্য কি সংবিধানে কোনো বিশেষ ধারা যুক্ত করা উচিত নয়?

এমন পরিস্থিতিতে আমাদের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বিষয়ক মূল চেতনা অক্ষুন্ন রেখে রাষ্ট্র ও সমাজের সুষম উন্নয়ন এবং বিকাশের স্বার্থেই সংবিধানের নতুন সংশোধনীতে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

ক) জাতিগোষ্ঠী, গাত্রবর্ণ, ভাষা, বংশ বা সামাজিক উৎপত্তির ভিত্তিতে দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্যমান সব বৈষম্য বিলোপ করতে সরকারি-আধা সরকারি ও বেসরকারি সব সংস্থা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর প্রতি সাংবিধানিক নির্দেশনা জারি করতে হবে;

খ) সব নাগরিকের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-জন্ম বা বংশ পরিচয় অথবা সামাজিক উৎস কিংবা পেশার ভিত্তিতে কোনো শিক্ষার্থীর প্রতি যে কোনো মাত্রার বৈষম্য প্রদর্শন দণ্ডনীয় অপরাধ বলে সাংবিধানিক ঘোষণা থাকতে হবে;

গ) সংবিধানের ১৫ ধারায় মৌলিক চাহিদা হিসেবে বর্ণিত আশ্রয় বা বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশি-ষ্ট বিভাগের মাধ্যমে ভূমি সংস্কার করে ভূমিহীন দলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে তা বণ্টনের জন্য সংবিধানে নির্দেশনা থাকতে হবে;

ঘ) দলিত জনগোষ্ঠীর কথা উলে-খ করে জন্ম ও পেশাভিত্তিক অস্পৃশ্যতাকে সংবিধানে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।

এই দাবিগুলো বিবেচনায় নিয়ে কিংবা জন্ম ও পেশাভিত্তিক বৈষম্য কার্যকরভাবে দূরীকরণের লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রণীত খসড়া নীতিমালা ও নির্দেশনাবলির আলোকে অথবা সরকার স্বপ্রণোদিত হয়ে বর্তমান সংবিধানের ২৮ (৪) ধারার ভিত্তিতে সংবিধানের আসন্ন সংশোধনীতে বিশেষ ধারা সংযোজন এবং প্রযোজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারে। ▣

**আবুল বাসার** : নাগরিক উদ্যোগ
ই-মেইল: bashar.arif@gmail.com

## নারী মুক্তিযোদ্ধাদের কথামালা

# আহত সহযোদ্ধাদের সুস্থ করে তুলতে কত পথ যে হেঁটেছি

ডা. সৈয়দা বদরুন নাহার বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদ থেকে ২০০৮ সালে অবসর নেন। তার মুক্তিবার্তা নাম্বার ০২০৫০১০২০৮। জন্ম ১৫ জানুয়ারি ১৯৫০। পৈতৃক বাড়ি কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে। বাবা সৈয়দ দরবেশ আলী সরকারি চাকুরে ছিলেন। মা সৈয়দা সামছুন নাহার ছিলেন গৃহিণী। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। স্বামী অ্যাডভোকেট তোফাজ্জল হোসেন নসু চৌধুরীও বীর মুক্তিযোদ্ধা। বর্তমানে তিনি গ্রামের বাড়িতে না থাকলেও প্রতি সপ্তাহে সেখানে গিয়ে গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি বলেন, একাত্তরের ২৫ মার্চের সেই বিভীষিকাময় রাত। ঢাকা শহরে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর আশপাশে গুলি ও কামানের প্রচণ্ড হামলা। পাকিস্তানি সেনারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করেছে। আমি ও আমার স্বামী ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যাই। আমি তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্রী। স্বামী তোফাজ্জল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র। প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের ছাত্রনেতা। তার দুই বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়। ঢাকার পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে এমনটা আঁচ করতে পেরে আমি ২৭ মার্চ স্বামীসহ ঢাকা থেকে নদীপথে চাঁদপুর চলে যাই। ইতিমধ্যে মার্চ পেরিয়ে এলো এপ্রিল। হানাদাররা তাদের এ দেশীয় দোসরদের সহায়তায় রাজধানী ছেড়ে ক্রমেই সারা দেশের গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। চাঁদপুর মহকুমা ও থানাগুলোতেও তাদের নখর বিস্তৃত হলো। আমার স্বামী যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিলেন। আমার ধমনিতেও চেতনার শিহরণ বইছিল। তাই সঙ্গী হলাম আমি ও আমার বড় ভাসুর। আমরা নৌকাযোগে বেরিয়ে পড়লাম। ১০ এপ্রিল শুরু হলো যুদ্ধ যাত্রা।

নৌকায় করে ডাকাতিয়া নদী পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেলাম লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ থানার পানিওয়ালা এলাকায় যেখানে ছিল এঅঞ্চলের মুক্তিকামী জনতার স্বাধীন ক্যাম্প। যুদ্ধ পরিচালনা আর নানা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং কাউকে যদি প্রশিক্ষণের জন্য ভারত পাঠাতে হতো তা এ পানিওয়ালা ক্যাম্প থেকেই করা হতো। এর সামরিক কমান্ডার ছিলেন বাঙালি ক্যাপ্টেন জহিরুল হক পাঠান। এ ক্যাম্পে এফএফ কমান্ডো দেলোয়ার হোসেন বাবু, নায়েক সুবেদার আবদুল, হাবিলদার আবদুস সাত্তারসহ অন্যদের সঙ্গে আমিও সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিলাম। তবে আমার ওপর দায়িত্ব দেয়া হলো যুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবার। বৃহত্তর কুমিল-া ও নোয়াখালীর ১১টি অঞ্চলে আমাকে কাজ করতে হতো।

এ সময় আমার নিরাপত্তার জন্য একটি ধারালো ছোরা সঙ্গে রাখতাম। যদি শত্রুবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যাই তাহলে তাদের হাতে সম্ভ্রম নষ্ট বা প্রাণ হারানোর আগে ঘুমের ওষুধ খেয়ে নেওয়ারও প্রস্তুতি ছিল। এক সময় আমাকে মধুমতি রেজিমেন্টের মেডিক্যাল অফিসার পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর বুধবার। আমাদের অধিনায়ক জহিরুল হক পাঠানের কাছে সংবাদ এলো– চাঁদপুরের শাহরাস্তি অফিস চিতোষী এলাকার একটি স্কুলে কয়েক জন নারীকে আটকে রেখে পাকিস্তানি ও রাজাকাররা নির্যাতন চালাচ্ছে। আমরা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা স্কুলের চারপাশ ঘিরে ফেলি। থেমে থেমে ৪৮ ঘণ্টা যুদ্ধ হলো।

অনেক পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার মারা পড়ল। কেউ কেউ পালিয়ে গেল। স্কুলের ভেতর থেকে গোপন একটি বাংকার থেকে উলঙ্গ ও অর্ধমৃত অবস্থায় ১২টি মেয়েকে উদ্ধার করলাম। আমার সহযোদ্ধারা তাদের গায়ের জামা খুলে বোনদের শরীর ঢেকে দিল। পরে সেখান থেকে তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা হলো। আমি সেবা দিয়ে তাদের সুস্থ করে তুললাম। পরে যুদ্ধের তিন মাস ধরে তারা আমার কাছেই ছিল।

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ থানার শাশিয়ালী গ্রামে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবেলা করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হন মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফারুক। সহযোদ্ধারা তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় পানিওয়ালা ক্যাম্পে নিয়ে যান। আমার কাছে উপযুক্ত চিকিৎসা সামগ্রী ছিল না। প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারিনি। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে সেই মুক্তিযোদ্ধা মারা যান।

যুদ্ধকালে এটাই ছিল আমার বড় ব্যর্থতা। আজও আমার মনে সেই স্মৃতি জেগে উঠলে নিজেকে বড় অপরাধী ভাবি। এমন আরো অনেক ঘটনা। যুদ্ধের ৩৮ বছর পর তা আজ আর তেমন স্মৃতিতে আসছে না। আহত সহযোদ্ধাদের সুস্থ করে তুলতে কত পথ যে হেঁটেছি। তার কোনো হিসাব নেই।

এক সময় আমি নোয়াখালীর চন্দ্রগঞ্জ এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। পাকিস্তানি বাহিনী আসছে শুনে গভীর রাতে নৌকা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলাম। হানাদারদের সাথে থাকা রাজাকাররা টর্চের আলো জ্বালিয়ে নৌকাটি থামাতে বলল। নৌকার মাঝির ছিল বুদ্ধিমান ও সাহসী। আমাকে বলল, আপা আপনি পানিতে নেমে পড়ুন। আমি দেখছি কি করা যায়। সে আস্তে আস্তে নৌকা চালাতে লাগল আর আমি নৌকা ধরে এগোচ্ছিলাম। কাউকে না পেয়ে রাজাকাররা নৌকাটি ছেড়ে দিল। দেখলাম পানিতে কিছু লাশ আমার পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। যুদ্ধের প্রায় ৮ মাস বৃহত্তর কুমিল-া ও নেয়াখালীর বিভিন্ন স্থানে গুলিবিদ্ধ শতাধিক মুক্তিযোদ্ধাকে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছি। ৮ ডিসেম্বর চাঁদপুর মুক্তদিবসে আমি মিত্র বাহিনীর সঙ্গে চাঁদপুর প্রবেশ করি। মুক্তিযুদ্ধের পর ফের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ক্লাস শুরু করি। আমি কৃতিত্বের সঙ্গে এমবিবিএস পাস করি। পরে সরকারি চাকরিতে যোগ দেই। ▣

**অনুলিখন:** ফারুক আহম্মদ, সাংবাদিক

# আমি একবার অন্তত বিজয় দিবস অথবা স্বাধীনতা দিবসের মঞ্চে উঠতে চাই

পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলার আমড়াজুড়ী ইউনিয়নের কৃষক মৃত রাজেন্দ্র নাথ রায় ও মৃত মনোরমা রায় দম্পতির চার সন্তানের মধ্যে সবার বড় উর্মিলা রায়। তার স্বামী মৃত শরৎ চন্দ্র রায়ের বাড়ি ঝালকাঠির শেখেরহাট ইউনিয়নের সেওতা গ্রামে হলেও মুক্তিযুদ্ধের সময় কাউখালী অঞ্চলে সক্রিয় অংশ নেন উর্মিলা।

তিনি বলেন, ১০ বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়ে যায়। আমার বাবা রাজেন্দ্রনাথ রায় ও মা মনোরমা রায় আমাকে কেন বাল্যকালে বিয়ে দিয়েছিলেন, মনে নেই। আমার বাবা ছিলেন কৃষক। আমরা দুই ভাই, দুই বোন। আমি ছিলাম সবার বড়। অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ায় আমার আর পড়াশোনা হয়নি। পিরোজপুরের কাউখালীর আমড়াজুড়ী ইউনিয়নের গন্ধর্ব গ্রামে আমার বাবার বাড়ি। ঝালকাঠির গরঙ্গল গ্রামের শরৎচন্দ্র রায়ের সঙ্গে আমার ১০ বছর বয়সে বিয়ে হয়। আমর একমাত্র সন্তান জন্ম নেয়। মেয়ের বয়স যখন ১০ মাস তখন আমার স্বামী লিভার ক্যান্সারে মারা যান।

আমি খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়ে যাই। খুব কষ্টে আমার জীবন চলছিল। অন্যের বাড়িতে কাজ করে মেয়েকে নিয়ে কোনোমতে বেঁচে ছিলাম। এমন সময়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। সেদিন ভাদ্র মাস। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা। ভরা বৃষ্টি আর ভরা পূর্ণিমায় পুরো গ্রাম ভাসছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত নেমেছে। কাউখালীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল্লা হাই পনা সেই রাতে ১০-১২ জনের মুক্তিযোদ্ধার দল নিয়ে আমার বাড়িতে আসেন। তারা আমার কাছে ওই রাতে আশ্রয় চান। আমি তাদের আশ্রয় দিই।

রাতে সেই যোদ্ধাদের জন্য খাবার রান্না করি। সন্তানের মতো পরম মমতায় আমি তাদের খেতে দিই। পরদিন শুক্রবার সারাদিন ও রাত তারা আমার বাড়িতে থাকেন। আমি আনন্দিত মনে তাদের সেবা শুশ্রূষা করি। পরদিন শনিবার আমার জীবনে ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। আমার ঘরের বারান্দায় বসে মুক্তিযোদ্ধা বারেক একটি রাইফেল নাড়াচাড়া করছিলেন। আমার মেয়ে পুষ্প কৌতূহলভরে রাইফেল নাড়াচাড়া দেখছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা বারেকের মনে ছিল না রাইফেলে গুলি ভরা আছে। হঠাৎ চাপ লেগে বিকট শব্দে একটি গুলি বেরিয়ে আসে। গুলিটি আমার আদরের মেয়ের কণ্ঠনালি ভেদ করে মাথার পেছন দিয়ে বেরিয়ে যায়। মেয়েটা আমার চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আমার চোখের সামনে মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায় সব। আমি আমার শেষ অবলম্বন হারিয়ে ফেলি। মৃত সন্তানের নিথর দেহটি মুক্তিযোদ্ধারা কেঁদে কেঁদে সমাধিস্থ করেন।

ওইদিন রাতে মুক্তিযোদ্ধার দলটি আমার বাড়ি থেকে চলে যায়। সপ্তাহখানেক পর তারা আবার আমার বাড়িতে আসেন। আমাকে সান্ত্বনা দেন। আমি অসহায় বলে তারা আমাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। জীবনে আমি একা, আমার কোনো পিছুটান নেই। তাই আমি তাদের সঙ্গে যাই।

ঝালকাঠির সেওতা গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ক্যাম্প ছিল। সেখানে আমাকে নিয়ে যান তারা। সেখানে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার রান্না করার দায়িত্ব নিই। যুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষারও কাজ করি। এভাবে সেওতা ক্যাম্পে আমার ছয় মাস কেটে যায়। মুক্তিযেদ্ধাদের সঙ্গে থেকে আমি আমার স্বামী-সন্তান হারানোর কষ্ট ভুলে যাই।

মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশের অনেক হিন্দুই প্রাণ ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। আমি যেতে পারিনি। দেশ ছাড়তে পারিনি। যার কেউ নেই সে দেশ ছেড়ে যাবে কোথায়?

আমি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মিলেমিশে যাই, স্বপ্ন দেখি দেশ স্বাধীনের। আমি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরি। তাদের আহার ও সেবা-শুশ্রূষার সংস্থান করি। শুধু তাই নয়, তাদের অস্ত্র সংরক্ষণের দায়িত্বও ছিল আমার। এ কঠিন দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিই শুধু দেশের স্বাধীনতার কথা ভেবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে কাজ করতে করতে দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। স্বামী ও সন্তান-হারা আমি তখন আরো বিপাকে পড়ে যাই। আমার কিছু নেই। ঘর নেই, সন্তান নেই। আমি স্বাধীন দেশে যেন এক উদ্বাস্তু। যুদ্ধের পর গরঙ্গল গ্রামে স্বামীর বিধ্বস্ত ভিটায় ফিরে আসি। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয় আর আমার শুরু হয় আরেক যুদ্ধ। আমাকে দেখার মতো কেউ ছিল না। পাঁচ বছর স্বামীর ভিটায়ই ছিলাম। কিন্তু ওখানে আমার জীবন চলছিল না। জীবন বাঁচাতে আমাকে আবার ফিরে আসতে হয় কাউখালীর গন্ধব গ্রামের বাবার বাড়িতে। এখানে এসে ভাত ও আশ্রয় মিলে। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই চোখের সামনে বাবা-মায়ের মৃত্যু ঘটে। আবার আমি স্বজনহারা। সন্ধ্যা নদীর ভাঙনে একদিন পৈতৃক ভিটাও বিলীন হয়। আমি আবার আশ্রয়হীন হয়ে পড়ি।

এখন আমার ৭০ বছর বয়স। দুই বছর ধরে আমি নদীভাঙনে গৃহহীন মানুষের জন্য সরকারি বস্তিতে থাকছি। আমার মতো নদীভাঙা আরো মানুষের আশ্রয় মিলেছে এখানে। একটাই ঘর। বড় কষ্টে থাকি এখানে। আমার কেউ নেই এখানে। মক্তিযুদ্ধ করেছি। এ জন্য আবাসনের সবাই আমাকে মায়া করে। কিন্তু অনাহার-অর্ধাহারে দিন কাটছে আমার। কেউ আমার খোঁজ নেয় না। মানুষের কাছে হাত পাততে লজ্জা হয়। কিন্তু কী করবো? মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমাকে ভাতা দেয়া হয় না। বয়স্ক ভাতার তালিকায় আমার নাম নেই। বিধবা ভাতার তালিকায়ও না। বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস– কোনো দিবসেই আমাকে কেউ ডাকে না।

সমাজসেবক আব্দুল লতিফ খসরু মাঝে মাঝে আমার খোঁজ নিতে আসেন। শেষ বয়সে আমি অনেক রোগে ভুগছি। হাঁটতে অনেক কষ্ট হয়। আমি একবার অন্তত বিজয় দিবস বা স্বাধীনতা দিবসের মঞ্চে উঠতে চাই। সেখানে আমার যুদ্ধের কথা বলতে চাই। ◻

**অনুলিখন:** দেবদাস মজুমদার, সাংবাদিক

# আদিবাসীর প্রান্তিকতা
# উত্তরবঙ্গের বাস্তবতা

আজ বিশ্বব্যাপী যখন মানবতাবাদী আন্দোলন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে, মানুষে মানুষে যাতে বিভেদ না করা হয় এনিয়ে সরকার থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী-নীতিনির্ধারক মহল যখন তৎপর তখন বাংলাদেশের ভেতরেই বৈষম্য করা হচ্ছে জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে যা মানুষের মানবতাবাদী সব চিন্তা বিপন্ন করে। বিষয়গুলো এমন যে, একজন মানুষ বাঙালি অথবা মুসলমান নয় বলে তাকে চাস্টলে চা খেতে দেয়া যাবে না কিংবা তার যতো ক্ষুধাই লাগুক কোনো হোটেলে সে খেতে পারবে না। স্কুল-কলেজ তো বটেই, এমনকি ইউনিয়ন পরিষদেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য তার সব কিছু আলাদা থাকতে হবে। শহরে বসে এসব বিষয় চিন্তা করা না গেলেও বাংলাদেশেরই উত্তরবঙ্গে এঘটনাগুলো খুবই স্বাভাবিক। এর বাইরে চিন্তা করতে গেলে অনেক বিপত্তির শিকার হতে হবে এটি নিশ্চিত করেই বলা যায়।

রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের যেসব অঞ্চলে আদিবাসীরা বসবাস করে সে সব অঞ্চলের চিত্র এগুলো। কিছুদিন আগে দেখা গেছে রাজশাহীতে একটি কলেজের হোস্টেলে আদিবাসী ১৩ জন ছাত্রের প্লেট বাটি আলাদা করে দেয়া হলে আদিবাসী ছাত্ররা সাথে সাথে এর প্রতিবাদ করে। এ সমস্যার সমাধানে আদিবাসী নেতারা এগিয়ে এলেন এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলার পর সেখানকার বাজারের একটি হোটেলে ঢুকলে সেখানে তাদের বলা হয়- আদিবাসীদের খাবার হবে না। আদিবাসী এ নেতাদের সাথে এক স্কুলের প্রধান শিক্ষকও (প্রধান শিক্ষক একজন আদিবাসী সাঁওতাল) ছিলেন।

এ ঘটনায় আদিবাসীদের প্রতি এ ধরনের বৈষম্য বন্ধ করতে আদিবাসী এবং বিবেকবান মানুষ মানববন্ধন করেছেন। এরপর স্থানীয় প্রশাসন হোটেলগুলোতে বৈষম্য না করতে নির্দেশ দিলেও ভাগ্যের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি আদিবাসীদের। বিষয়টি সারা দেশের বিবেকবান মানুষকে আলোড়িত করেছিল। আধুনিক যুগে এ ধরনের মানবতা বিরোধী বৈষম্যমূলক বিষয়টি মানবতাকে শুধু অপমানই করে না, পাশাপাশি নিয়ে যায় অন্ধকারে। অথচ বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।' এবং ২৮ (১)- এ বলা আছে, 'কেবল ধর্ম,

গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।' ফলে দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্র সব নাগরিকের সমান অধিকার দিলেও আদিবাসীরা কেবল ধর্ম বা জাতিভেদের কারণে তাদের বসবাসের স্থানের আশপাশের হোটেলে ঢোকার অনুমতি পায় না। স্থানীয় কিছু মানুষ তাদের স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতার জোরে এঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে। তারা বলছে, সাঁওতাল বা আদিবাসীরা হোটেলে খেলে নাকি ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। এ রকম গ্রাম্য ফতোয়ার মাধ্যমে বঞ্চিত করা হচ্ছে আদিবাসীদের। বাংলাদেশের সমতলের বিশেষ করে রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের আদিবাসীরা ভূমিসহ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। আরো হাজারো সমস্যার মতো এ সমস্যাও আদিবাসীরা নীরবে মেনে নিয়েছে। তারা মনে করে এটিই ঠিক অথবা এটাই স্বাভাবিক কিংবা তারা জানেই না যে এ বিষয়টি মানবতাকে কতটা লুণ্ঠিত করছে। অথবা জানলেও সমাজের আর দশটা প্রতিষ্ঠিত অন্যায়ের মতো তারা এটাকেও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। লঞ্ছিত মানবতা এখানেও গুমরে মরছে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস থেকে দেখতে পাই, যখন পর্যন্ত ভারতীয়রা একটি জাতীয়তাবাদী শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি সেই সময়ে আদিবাসীরাই প্রথম ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল (১৮৫৫ সালে) যা ইতিহাসে সাঁওতাল হুল নামে পরিচিত। এর নেতৃত্ব দিয়েছিল আদিবাসী সাঁওতাল নেতা সিদু, কানহু, চাঁদ, ভায়রো, ফুলমণি আর জানমণি। এখান থেকেই প্রথম অনুপ্রেরণা তৈরি হয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের। এরপর ১৮৯৫-১৯০০ সালে আমরা দেখি বিরসা মুন্ডাকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অরণ্যের অধিকারের জন্য সংগ্রাম (উলগুলান) করতে।

এছাড়া হাজং বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন ছিল আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন। আর ট্র্যাডিশনাল ঐতিহাসিকরা স্বীকার না করলেও এ কথা এখন পানির মতো সত্য, বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধেও আদিবাসীরা তাদের সংখ্যানুপাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক অস্ত্রহাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে বীরপ্রতীক কাঁকন বিবির নাম আমরা সবাই জানি। জাতি বৈচিত্র্যের বাংলাদেশে আদিবাসীরা সব সময়েই দুঃসময়ে দেশের পক্ষে দাঁড়িয়েছে।

*ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস থেকে দেখতে পাই, যখন পর্যন্ত ভারতীয়রা একটি জাতীয়তাবাদী শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি সেই সময়ে আদিবাসীরাই প্রথম ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল (১৮৫৫ সালে) যা ইতিহাসে সাঁওতাল হুল নামে পরিচিত। এর নেতৃত্ব দিয়েছিল আদিবাসী সাঁওতাল নেতা সিদু, কানহু, চাঁদ, ভায়রো, ফুলমণি আর জানমণি। এখান থেকেই প্রথম অনুপ্রেরণা তৈরি হয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের। এরপর ১৮৯৫-১৯০০ সালে আমরা দেখি বিরসা মুন্ডাকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অরণ্যের অধিকারের জন্য সংগ্রাম (উলগুলান) করতে।*

কিন্তু আজ স্বাধীন দেশে তারা পাচ্ছে না তাদের সামাজিক অধিকারটুকু। আত্মমর্যাদা নিয়ে তারা বেঁচে থাকতে পারছে না সমাজে। কেন এবৈষম্য? কেন এঅধিকারহীনতা? এ প্রশ্ন আজ বিবেকবান মানুষের। সমাজের আর দশজন বাঙালি মুসলমান-হিন্দুর মতো তাদেরও অধিকার রয়েছে স্বাধীনভাবে চলাফেরার আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার। প্রতিটি মানুষই সমাজ সুযোগ পাবার অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাহলে শুধু সাঁওতাল বা আদিবাসী হওয়ার করণে কেন কেউ কেউ সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হবে? তাদের এ প্রান্তিকতার কারণটা আসলে কি? কারণটা কি আসলে ধর্মীয়, না জাতিগত, নাকি সামাজিক, না অর্থনৈতিক।

প্রান্তিকতার কারণ যাই হোক, তা বর্তমান আধুনিক যুগে এসে কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। অন্তত চিন্তাশীল এবং আধুনিক কোনো মানুষই এটা মেনে নিতে পারে না। ভারতের অস্পৃশ্যতা এবং বর্ণবাদের শিকার নিম্ন গোত্রের হিন্দুরা বর্ণবাদীদের শিক্ষা দিয়েছিল হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে। দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গরা দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আজ অন্তত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বর্ণবাদ বিরোধী নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এরকম বহু আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষের উত্তরণ ঘটেছে।

যে মানুষ ছাড়া কথিত ভদ্রলোকদের একদিনও চলে না তাদের সাথে এ ধরনের অমানবিক আচরণ আসলে কাম্য নয়। সমাজের ক্ষমতাবান কিছু মানুষ দেশের পবিত্র সংবিধান, মানবাধিকার সনদ, জাতিসংঘের আদিবাসী অধিকার সনদকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আরেক শ্রেণীর মানুষকে অস্পৃশ্য করে রাখবে আর প্রতিনিয়ত লুণ্ঠন করবে মানবতাকে তা অবশ্যই রোধ করা প্রয়োজন।

সমতলের আদিবাসীরা এক সময় অবস্থাসম্পন্ন থাকলেও এখন তারা প্রান্তিকের প্রান্তিকতায় অবস্থান করছে। এ অবস্থা থেকে তাদের উত্তরণ ঘটানো না গেলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেহের কোনো অঙ্গ বাদ দিয়ে যেমন শরীর পরিপূর্ণ হয় না তেমনি জাতিবৈচিত্র্যের বাংলাদেশে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী বা আদিবাসী বাদ দিয়ে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূলশক্তি হলো কৃষি। উত্তরবঙ্গের কৃষির মূল উৎপাদিকা শক্তিই হলো আদিবাসী জনগোষ্ঠী। তাই তাদের বাদ দিয়ে বা কোণঠাঁসা করে কোনোভাবেই টেকসই উন্নয়ন হবে বলে আসা করা যায় না। তাছাড়া ধর্মীয় বা সামাজিকতার দোহাই দিয়ে অস্পৃশ্যতাকে লালন করে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন হয়েছে এ কথাও বলা যাবে না। সচেতন বিবেকবান কোনো মানুষই তা মন থেকে মেনে নেবে না, নিতে পারে না। তাই আদিবাসী-দলিতসহ তথাকথিত অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীকে তাদের সামাজিক অপমান থেকে মুক্ত করে অর্থাৎ মানুষ হিসেবে আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে দিয়ে মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত করতে সমাজের সব বিবেকবান মানুষসহ প্রত্যেককে যেমন হাতে হাত ধরে এগিয়ে আসতে হবে তেমনি এগিয়ে আসতে হবে সরকারকেও। ফিরিয়ে দিতে হবে কুক্ষিগত হওয়া সব নিপীড়িত বঞ্চিতের মানবাধিকার। ◻

এম এম কবীর মামুন : নাগরিক উদ্যোগ
ইমেইল : krmamun334@yahoo.com

## দ্য আনহার্ড ট্রুথ

# দারিদ্র্য এবং মানবাধিকার

- *বিশ্বব্যাপী ৯৬৩,০০০,০০০ মানুষ প্রতি রাতে অনাহারে ঘুমাতে যায়*
- *২,৫০০,০০০,০০০ মানুষের পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধা নেই*
- *১,০০০,০০০,০০০ মানুষ বস্তিতে বসবাস করে*
- *৫০০,০০০ গর্ভবতী নারী প্রতি বছর মারা যাচ্ছেন প্রসূতিকালীন কিংবা গর্ভজনিত জটিলতায় যার ৯৯%ই উন্নয়নশীল দেশে*
- *২০,০০০ শিশু প্রতিদিন মারা যাচ্ছে*

এসব বাস্তবতার আলোকে আইরিন খান **The Unheard Truth: Poverty And Human Rights** গ্রন্থে তাবৎ দুনিয়াকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন দারিদ্র্য শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নয়' বরং এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ২০০৯ সালে থেকে প্রকাশিত এ বই জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের মতে, `A well argued critique of mainstream thinking on development/poverty the language avoids jargon while remaining conceptually rigorous and accurate.' মানবাধিকার আন্দোলনের আন্তর্জাতিক নেতা ও সংগঠক হিসেবে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের অবস্থা এবং অবস্থান প্রত্যক্ষ করেছেন। বাংলাদেশের কড়াইল বস্তি থেকে শুরু করে কেনিয়া, মুম্বাই কিংবা ব্রাজিলের সাওপাওলো বস্তিতে ঘুরে দেখেছেন মানুষের দুঃখ-দুর্দশা।

বিভিন্ন দেশি-বিদেশি সংস্থা, ফিল্যানথ্রপিস্ট, রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী, এমনকি সেলিব্রেটি আর রকস্টাররা দারিদ্র্য নিরসন কিংবা দারিদ্র্যের শেকড় উৎপাটন করার জন্য 'চিৎকার' করে গলা ফাটালেও গত কয়েক দশকে তা বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ। আইরিন খানের মতে, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো সাধারণত অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী ও নীতি-নির্ধারকদের চিন্তা এবং কর্মসূচিতে শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি তথা বিনিয়োগ, বাণিজ্য, নিত্য-নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে দেখা। তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাথে দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের নিরন্তর বৈষম্য ও বঞ্চনা (Exclusion), নিরাপত্তাহীনতা এবং ক্ষমতাহীনতার বিষয়গুলো সমধিক গুরুত্ব বিবেচনার দাবি রাখে। দারিদ্র্য মানুষের কেবল সম্পদের অভাবই নয়, নিজের জীবনের ওপরও তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। দারিদ্র্য মোকাবেলার সাথে মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি জরুরি। কারণ মানবাধিকার লংঘনের ফলে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয়, দারিদ্র্যের মাত্রা বেড়ে যায়, দারিদ্র্য টিকিয়ে রাখে ফলে মানুষ দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র থেকে বের হয়ে আসতে পারে না।

একটি অত্যন্ত উদ্দীপক ঘটনা দিয়ে বইটি শুরু হয়েছে। ৫০ বছর আগে আইরিন খান ও ফজর আলী প্রায় একই সময়ে ঢাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। তারা এক সাথে একই ছাদের নিচে বেড়ে ওঠেন। ছোটবেলার খেলার সাথী ফজর আলী মেধাসম্পন্ন ছিলেন, জোর গলায় গান গাইতেন, ছবি আঁকতেন ও টিনের কৌটো দিয়ে মজার সব খেলনা বানাতেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে আইরিন খান নাম করা স্কুলে ভর্তি হলেন। ঢাকায় পড়ার পাট চুকিয়ে বিদেশে বড় ডিগ্রি নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি দিয়ে তার কর্মজীবন শুরু করেন। ফজর আলী ভর্তির এক বছরের মাথায় স্কুল ছাড়তে বাধ্য হলেন। শিক্ষক, সহপাঠী ও বন্ধুরা 'কাজের লোকের ছেলে' বলে ফজর আলীকে তিরস্কার করতো। তাকে 'অন্য চোখে' দেখতো। এক পর্যায়ে সরকারি কারখানায় চাকরি নিলেন। ১৬ বছর বয়সে ১৪ বছরের এক কিশোরীকে বিয়ে করলেন। চাকরি চলে যাওয়ার পর রিক্সা চালাতেন। রাজনৈতিক গণ্ডগোলের শিকারে পড়ে তা ভেঙে গেলে সহায়সম্বল হারিয়ে তিনি ছোটখাট অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়েন। ফলোশ্রুতিতে একদিন গণধোলাই খেয়ে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েন। এখন ছেলের সামান্য আয়ের ওপর নির্ভরশীল ফজর আলী ঢাকার কোনো এক বস্তিতে কোনো রকমে জীবন সংগ্রামে টিকে আছেন। এ ফজর আলীই দারিদ্র্যের প্রতীক যার জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই। সুযোগ-সুবিধার অভাব, নিরাপত্তাহীনতা, দারিদ্র্য, বঞ্চনার কারণে প্রতি নিয়ত যাকে জীবন সংগ্রাম করেও অবশেষে পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়েছে।

বিশ্ব ব্যাংকের মতে, যাদের দৈনিক গড় আয় ১ দশমিক ২৫ ডলারের নিচে তারা অতিদরিদ্র আর যাদের দৈনিক গড় আয় ২ ডলারের নিচে তারা দরিদ্র। এ হিসাব অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে ১ বিলিয়ন অতি দরিদ্র ও ২ বিলিয়ন দরিদ্র মানুষের বসবাস। আইরিন খানের মতে, কেবল মাথাপিছু আয় ২ ডলারের থেকে বৃদ্ধি করলেই দরিদ্র মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, বৈষম্য থেকে মুক্তি ও সার্বিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারে না। পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে হয়তো কৃষকের শষ্য উৎপাদন বাড়তে পারে কিন্তু তার ফলে রাতারাতি ভূস্বামী ও দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের 'কালো ছোবল' থেকে সে মুক্তি পাবে না। ঠিক একইভাবে পাড়ায় স্কুল স্থাপিত হলেই মেয়েশিশু কিংবা দলিত ও বঞ্চিত সমাজের ছেলেমেয়েদের স্কুলে শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার গ্যারান্টি দেয়া যায় না। অমর্ত্য সেনের মতে'

Freedom is both a constituent component of development and a contributing factor to its achievement. When we measure poverty end, we should go beyond poverty level.

দুঃখজনক হলো, এখন পর্যন্ত দরিদ্রতা শুধু সম্পদ বা অর্থনৈতিক মাপকাঠি দিয়েই বিচার করা হয়। ফলে তা বিমোচন বা নিরসনে অর্থনৈতিক সূচকগুলোই সামনে চলে আসে। ফলে শুধু বিনিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, নতুন প্রযুক্তি আর বিদেশি সাহয্যের মধ্যেই দারিদ্র্য বিমোচনের ইস্যুটি বারবার ঘুরপাক খায়।

বৈষম্য ও বঞ্চনা মানুষকে দরিদ্রতার জালে আটকে রাখে। লক্ষ্য করা গেছে, বিশ্বের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের বেশির ভাগই কোনো না কোনো ভাবে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। তারা প্রান্তিক মাইনরিটি কমিউনিটি। যখন কোনো রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করে তখনো দেখা যায়, এ বৈষম্যের কারণে তারা যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে যায়। এ বৈষম্য বিভিন্ন ধরনের যেমন– জেন্ডার, সেক্সুয়ালিটি, জাতিগত, জাতপাত, ধর্মবিশ্বাস, প্রতিবন্ধীত্ব ইত্যাদি। ফলে বলা যায়, যদি বৈষম্য, প্রান্তিকতা ও বঞ্চনার দিকে বিশেষ নজর না দেয়া যায় তবে কোনো কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে আর কেউ পেছনেই পড়ে থাকবে, এমনকি আরো বৈষম্যেও সৃষ্টি হতে পারে।

আইরিন খানের মতে, দারিদ্র্য বিমোচনের ইস্যুতে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থা পরিবর্তনের দিকে নজর দিতে হবে। এ ব্যবস্থায় বাজারই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে আর রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য দিন দিন কমে আসে। কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রই কেবল জনগণের মানবাধিকার সংরক্ষণ করতে পারে আর এ ধরনের রাষ্ট্রই কেবল দারিদ্র্যের মৃত্যু ঘটাতে পারে। অন্যদিকে দারিদ্র্যের কারণ ও ফল মানবাধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনায় আনলে দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়ন এবং শাসকশ্রেণীর জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ফলে দরিদ্র মানুষ সত্যিকার অর্থে উন্নয়নের মূল কেন্দ্র হবে। অবশ্য সেক্ষেত্রে খানের মতে, শক্তিশালীদের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদ মেনে চলতে হবে। তবে প্রশ্ন থেকেই যায়, অমানবিক বিশ্বায়ন, কর্পোরেট ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় পুঁজির আগ্রাসন, সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতি দানবদের মোকাবেলা করে কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে কীভাবে। তারপরও আইরিন খানের আশাবাদ 'The fight to end poverty is the generation's greatest struggle. We will win it if we put freedom, justice and equality at its core'.

উলে-খ্য, আইরিন খান অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাবেক মহাসচিব। এ পদে তিনি প্রথম এশিয়ান, প্রথম নারী এবং প্রথম মুসলিম। ২০০১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি জাতিসংঘের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। হার্ভার্ড ও ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে লেখাপড়া করেছেন। জাপান, বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন তিনি। ২০০২ সালে পেলকিনটন বর্ষসেরা নারী এবং ২০০৬ সালে সিডনি থেকে শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের ইংরেজি জাতীয় দৈনিক ডেইলি স্টারের সাথে যুক্ত রয়েছেন। ◻

**মাজহারুল ইসলাম** : উন্নয়ন কর্মী ও গবেষক
ই-মেইল : mazhar1971@yahoo.com

# ২০১০ ছিল পাকিস্তানের জন্য মানবাধিকার বিপর্যয়ের বছর

পাকিস্তানের জন্য গত বছরটি ছিল মানবাধিকারের দিক থেকে বিপর্যয়কর। জঙ্গি হামলায় শত শত মানুষ নিহত হওয়া ছাড়াও পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ও সংখ্যালঘু নিপীড়নের নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ ছিল বছরটি। পাকিস্তানে গত বছর তালেবান সহিংসতা এবং ধর্মীয় উগ্রবাদ বেড়েছে। কিন্তু সরকার পরিস্থিতি উন্নয়নে সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট না হওয়ার পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে গেছে। মানবাধিকার সংগঠন 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' (এইচআরডবি-উ) তাদের প্রতিবেদনে এ কথা প্রকাশ করেছে।

২০১১ সালের ওয়ার্ল্ড রিপোর্টে এইচআরডবি-উ বলেছে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়নে প্রচ্ছন্ন সমর্থন থেকে জঙ্গি সহিংসতা বেড়েছে। এর পেছনে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো থেকেও সক্রিয় সহায়তা আছে বলে উলে-খ করা হয়েছে রিপোর্টে। তালেবান সহিংসতা শূন্যের মধ্যে ঘটছে না। এর পেছনে গোয়েন্দা বিভাগ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলের গোপন সমর্থন আছে বলেন হিউম্যান রইটস ওয়াচের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক গবেষক আলি দয়ান হাসান। রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত বছর জঙ্গি হামলায় নিহত হয়েছে শত শত মানুষ, খুন হয়েছে ১১ জন সাংবাদিক, পরিকল্পিত হত্যার ঘটনায় করাচি ছিল সন্ত্রস্ত, সংখ্যালঘুরা নিপীড়নের শিকার হয়েছে। বিভিন্ন হামলায় নিহত হয়েছে অন্তত ৮০ জন আহমাদিয়া। ব-াসফেমি আইনের বিরুদ্ধে কথা বলায় দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হয়েছেন পাঞ্জাবের গভর্নর সালমান তাসির। ওই আইন পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলা শেরি রেহমানও প্রাণনাশের হুমকির কারণে কার্যত ঘরবন্দি। তালেবান সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে। তা সামাল দিতে গিয়ে সেনাবাহিনী যে লড়াইয়ে নেমেছে তাতেও মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে জানিয়েছে এইচআরডবি-উ। বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোকে এইচআরডবি-উ 'যুদ্ধপরাধ' বলেই গণ্য করেছে। তালেবান জঙ্গি সন্দেহে পাকড়াও করা অনেককেই গত বছর অবৈধভাবে এবং গোপনে সামরিক হেফাজতে রাখা হয়। তাছাড়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কয়েকটি ইউনিটে বন্দিদের দ্রুত বিচারে বেশকিছু মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ঘটনাও ঘটেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সমস্ত ঘটনার তদন্ত দাবি করেছে হিউমান রাইটস কমিশন অব পাকিস্তান (এইচআরসিপি)- এর চেয়ারম্যান মেহদি হাসান। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, পাকিস্তানে যেভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও মানবাধিকারের এমন লঙ্ঘন মেনে নেয়া যায় না। ◻

সূত্র : ইন্টারনেট

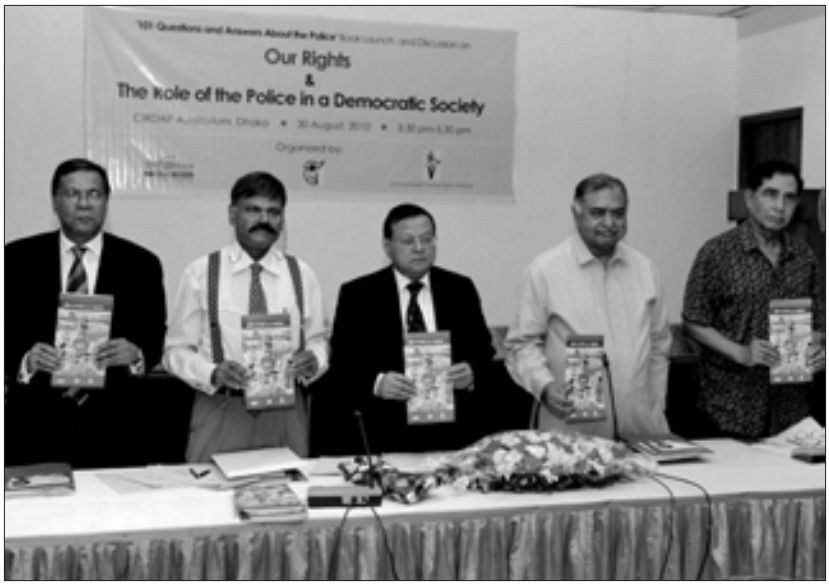


## বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের তদন্ত হবে–

## ‘পুলিশ সম্পর্কে ১০১টি প্রশ্নোত্তর’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন এবং ‘গণতান্ত্রিক সমাজে পুলিশের ভূমিকা’ শীর্ষক সেমিনারে আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ

বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ডের সাথে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কেউ জড়িত থাকলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে উল্লেখ করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ। গত ৩০ আগস্ট ২০১০ নাগরিক উদ্যোগ, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট এবং কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভের যৌথ প্রকাশনা ‘পুলিশ সম্পর্কে ১০১টি প্রশ্নোত্তর’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন এবং ‘গণতান্ত্রিক সমাজে পুলিশের ভূমিকা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে পুলিশসহ অন্যান্য বাহিনীর সদস্য। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা শুধু পুলিশের জন্যই হয় এমনটিও বলা যাবে না। এ ব্যাপারে নাগরিকদের আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। পুলিশকে শত্রু মনে করলে চলবে না। দেশে নতুন নতুন অপরাধ বাড়ছে। এসব অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করতেও আমাদের এক সাথে কাজ করা প্রয়োজন।

বিশিষ্ট আইনজীবী এবং সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান, বিচারপতি আওলাদ আলী, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং আইজিপি এএসএম শাহজাহান, সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা, ব-াস্টের নির্বাহী পরিচালক রাষ্ট্রদূত (অব:) মোহসিন আলী খান, নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন, উত্তম কুমার দাস প্রমুখ।

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান বলেন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কখনো সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। পুলিশ-র‍্যাব বলে যেকোন অন্যায় কাজ তারা করতে পারবে এমন ভাবা ঠিক নয়। পুলিশের সংখ্যার বিষয়ে তিনি বলেন, ১৫ কোটি মানুষের এ দেশে পুলিশ রয়েছে সোয়া ১ লাখ। কাজেই এ সংখ্যা দিয়ে সঠিকভাবে আইন-শৃঙ্খলা করা রক্ষা প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। তিনি ময়মনসিংহ জেলা কারাগারে মোটরসাইকেল চুরির অপরাধে আটক এক কিশোরের নির্মম শারীরিক নির্যাতন ভোগের কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

এএসএম শাহজাহান বলেন, এক পুলিশ যদি ঘুষ খায় তাহলে সব পুলিশকে ঘুষখোর বলে গালাগালি দেয়া হয়। কিন্তু একজন ডাক্তার যখন অস্ত্রোপাচার করার সময় পেটে তোয়ালে রেখে দেয় তখন কেন সব ডাক্তারের নামে অপবাদ দেয়া হয় না। আমাদের পুলিশের সমস্যার পাশাপাশি সম্ভাবনাগুলো নিয়েও আলাপ করতে হবে।

ড. কামাল হোসেন বলেন, বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা কমছে। এটা দীর্ঘ সময় চলতে থাকলে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে। তিনি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নির্বাচিত একটি সরকার কখনো এআচরণ করতে পারে না।

সাবেক আইজিপি নূরুল হুদা বলেন, সব পেশার মধ্যেই ইতিবাচক-নেতিবাচক দিক রয়েছে। পুলিশ বিভাগও এ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। তাদের মান-মর্যাদা বাড়ানোর প্রতিও সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে।

ব-াস্টের নির্বাহী পরিচালক মোহসিন আলী খান বলেন, পুলিশ সম্পর্কে মানুষের নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে। পুলিশের দায়িত্বশীল আচরণ এবং তাদের জীবনমানের উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন বলেন, পুলিশ নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় কাজ করবে এটাই সত্য। ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এবং আইনি সহায়তা লাভে এ দেশের প্রান্তিক মানুষের বঞ্চনা দূর করতে পুলিশ বিরাট অবদান রাখতে পারে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে কমিউনিটি পুলিশের ধারণা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ▣

# বাল্যবিয়ে সম্পাদনে সহযোগিতার দায়ে ইমামের কারাভোগ

বাল্যবিয়ে সম্পাদনে সহযোগিতার জন্য গত ২ সেপ্টেম্বর ২০১০ মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ১৯২৯ সালের বাল্যবিয়ে নিরোধ আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী কাজী ইমাম মোঃ আব্দুল্লাহকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এ ঘটনাটি ঘটে গঙ্গাচড়া উপজেলার বড়বিল গ্রামে। এ নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়।

এ ঘটনার শুরুটা ছিল একটু ভিন্ন রকম। মানবাধিকার সংগঠন নাগরিক উদ্যোগ এ উপজেলায় বিভিন্ন সময় বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে বিভিন্ন সভা-সমাবেশের আয়োজন করে সচেতনা সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি নাগরিক উদ্যোগের সহযোগিতায় সৃষ্ট মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দল এবং তৃণমূল নারীনেত্রী নেটওয়ার্কের সদস্যরাও বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এরই ধারাবাহিকতায় গঙ্গাচড়া উপজেলার বড়বিল ইউনিয়নের তৃণমূল নারীনেত্রী কোহিনুর বেগমের কন্যা রাজিয়া সুলতানার মাধ্যমে নাগরিক উদ্যোগের ওই ইউনিয়নের কমিউনিটি মবিলাইজারের কাছে খবর আসে, ওই ইউনিয়নের ঘাঘটটারী গ্রামের ষষ্ঠ শ্রেণী ছাত্রী মৌসুমীর বিয়ে হবে আজ। পাত্র একই গ্রামের লাল মোহনের পুত্র মহসীন। এ খবরের ভিত্তিতে নাগরিক উদ্যোগ- গঙ্গাচড়ার এরিয়া অফিসার তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন বিয়ের আয়োজন চলছে, পশু জবাই হয়ে গেছে, গেট সাজানো হচ্ছে। এরপরও মৌসুমীর বাবা মোক্তার হোসেনসহ এলাকার ব্যক্তিকে বাল্যবিয়ের কুফল এবং এর আইনি বিধি-নিষেধ সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করেন। অনেকেই তাতে সাড়া দিলেও মোক্তার হোসেন বিয়ে দিতে অনড় থাকে।

কেউ কেউ তাকে বললেন, কাজী বিয়ে না পড়ালে তারা মুন্সীকে দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবেন। এক পর্যায়ে মৌসুমীর বাবা এরিয়া অফিসার ও কমিউনিটি মবিলাইজারকে এ ব্যাপারে বাধা না দেয়ার জন্য আর্থিক প্রলোভন দেখানোর চেষ্টা করেন। তিনি ইউনিয়নের কাজিকে সবিস্তার বিষয়টি জানালে বিয়েটি পড়াবেন না বলে মতামত দেন।

*মৌসুমীর বাল্যবিয়ে রোধ করা সম্ভব না হলেও তার বিয়ে পড়ানো ইমামকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে এলাকায় বাল্যবিয়ের আইন ও এর শাস্তি সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ঘটনার এক মাস পর নাগরিক উদ্যোগে আবার এলাকা পরিদর্শনে গেলে কাজি বলেন, আমি না বুঝতে পেরে এ কাজ করেছি। মৌসুমীর বাবা মোক্তার হোসেন সমবেত গ্রামবাসীদের বলে, 'এখন এলাকাত তোমাক আর লাইগবার ন্যায়– হামরায় বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করবো'।*

এরপর নাগরিক উদ্যোগ বিষয়টি গঙ্গাচড়ার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানান এবং লিখিত আবেদন করেন। এরই প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিকেলেই উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান খায়রুল আলম বাবুকে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে বিয়ে বন্ধের নির্দেশ দেন এবং কাজির বাড়িতে গিয়ে তাকে বিয়ে না পড়ানোর জন্য বলেন। এর পাশাপাশি তিনি নাগরিক উদ্যোগ কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি ফলোআপ করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরো জানান, যদি মোক্তার হোসেন আবারও বিয়ের উদ্যোগ নেয়, সে ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিষয়টি নিয়ে একাধিক স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ ছাপা হয়। কিন্তু পরদিনই জানা যায় উল্টো ঘটনা। এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতায় রংপুর শহরের নোটারী পাবলিকের কাছে গিয়ে এফিডেফিট করে বয়স বাড়িয়ে ৩১ আগস্ট ২০১০ দুপুরে মৌসুমীর বিয়ে সম্পন্ন করা হয়।

সবাই ভেবেছিলেন মৌসুমীর বাবা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। ফলে মৌসুমীর বিয়ে হয়ে যাওয়ায় ওই এলাকার মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দলের সদস্য, নারীনেত্রী নেটওয়ার্কের সদস্য, নাগরিক উদ্যোগ কর্মী এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা– সকলেই কিছুটা হতবাক অবাক হন। তারা কীভাবে এ বেআইনি বাল্যবিয়ে বন্ধ করা যায় তা নিয়ে ভাবতে থাকেন। তাহলে কী প্রভাবশালীদের বদৌলতে এ অবিচার চলতেই থাকবে!

নাগরিক থেমে থাকেনি। ১ সেপ্টেম্বর ২০১০ নাগরিক উদ্যোগ এরিয়া অফিসের মাধ্যমে মৌসুমীর স্কুলের প্রত্যয়নপত্র ও ইউনিয়ন পরিষদের কাছ থেকে জন্ম সনদ সংগ্রহ করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে দেয়া হয়। এরই ভিত্তিতে পুলিশের সহযোগিতায় তিনি এলাকায় অভিযান চালান এবং বিয়ে পড়ানো ইমামকে গ্রেফতার করে সাজা প্রদান করেন।

মৌসুমীর বাল্যবিয়ে রোধ করা সম্ভব না হলেও তার বিয়ে পড়ানো ইমামকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে এলাকার মানুষের মধ্যে বাল্যবিয়ের আইন ও এর শাস্তি সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ওই এলাকায় ভবিষ্যতে বাল্যবিয়ের সংখ্যা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। এ ঘটনার এক মাস পর নাগরিক উদ্যোগের কর্মকর্তারা আবার এলাকা পরিদর্শন করেন এবং সাজাপ্রাপ্ত কাজি এবং মৌসুমীর বাবা-মায়ের সাথে আলাপ করেন। কাজি বলেন, আমি না বুঝতে পেরে এ কাজ করেছি। মৌসুমীর বাবা মোক্তার হোসেন সমবেত গ্রামবাসীদের বলে, 'এখন এলাকাত তোমাক আর লাইগবার ন্যায়– হামরায় বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করবো'। মৌসুমী এখন নিয়মিত পড়াশোনা করছে। তার স্বামী ঢাকায় গার্মেন্টে চাকরি নিয়েছে। চার বছর পর তাদের সংসার শুরু হবে। ◻

**সৈয়দ আরিফুল ইসলাম** : এরিয়া অফিসার, গঙ্গাচড়া

### মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

# তৃণমূলে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম সফল করার প্রত্যয়

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস সামনে রেখে গত ডিসেম্বর মাসে টাঙ্গাইল জেলার সদর এবং কালিহাতী উপজেলা, রংপুর জেলার সদর, বদরগঞ্জ এবং গঙ্গাচড়া উপজেলা, বরিশাল জেলার সদর এবং বানারীপাড়া উপজেলা এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগরে মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দলের অনুষ্ঠিত হয়। এ সব সম্মেলনে ৮৮টি ইউনিয়নের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দলের সদস্যদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কর্মী, সাংবাদিকরা অংশগ্রহণ করেন।

কালিহাতী উপজেলায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালিহাতী উপজেলার চেয়ারম্যান হাসান ইমাম খান সোহেল হাজারী। তিনি বলেন, লাখো মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। এস্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের মানবাধিকার রক্ষা করতে হবে।

বানারীপাড়া সম্মেলনের প্রধান অতিথির বক্তব্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) পংকজ ঘোষ বলেন, মানবাধিকার বলতে মানুষ হিসেবে আমরা কি কি অধিকার ভোগ করতে পারি তাই বুঝি। সকলকে অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সহনশীল হতে হবে।

রংপুর সদর উপজেলার সম্মেলনে উপস্থিত প্রধান অতিথি তথ্য কর্মকর্তা মঞ্জুর-ই-মওলা মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দলের নেতৃবৃন্দের প্রতি তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিয়ে কাজ করার অনুরোধ জানান।

বদরগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল আলম সরকার প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আপনারা মানবাধিকার বিষয়ে কাজ করেন। আপনাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই সমাজে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রতিহত করতে পারে।

বরিশাল সদরের সম্মেলনে বরিশাল সিটি কর্পোরেশরেশনের মেয়র শওকত হোসের হিরন, বরিশাল-১ আসনের সংসদ সদস্য তালুকদার মোহাম্মদ ইউনুস, টাঙ্গাইল সদরে সহকারী পুলিশ সুপার উত্তম প্রসাদ পাঠক, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ হেলালুজ্জামান সরকার, শ্রীনগরে উপজেলা চেয়ারম্যান বেলায়েত হোসেন ঢালী, ভাইস চেয়ারম্যান সোহেলা পারভীন রানু, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মঈনুদ্দিন সরকার এবং গঙ্গাচড়ায় উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ক্ষ্যান্ত রানী, গঙ্গাচড়া ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ জামিলুর রহমান অতিথি হিসেবে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

গত এক বছরে (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০১০) ৮টি কর্মএলাকায় এইচআরএমজি সদস্যরা নাগরিক উদ্যোগের নিবন্ধিত সালিশ মীমাংসায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি সদস্যরা নিজ উদ্যোগে স্থানীয় পর্যায়ে ১৭১২টি অভিযোগ মীমাংসা করেছেন। পারিবারিক নির্যাতন, দেনমোহর ও ভরণপোষণ সংক্রান্ত, জমিজমা, অর্থ পাওনা ও লেনদেনসহ বিভিন্ন অভিযোগ মীমাংসা করে উপকারভোগীদের পক্ষে ১৩,০৮৭,৫৫০/- (এক কোটি ত্রিশ লাখ সাতাশি হাজার পাঁচশ পঞ্চাশ টাকা) আদায় করে দিয়েছেন। গত এক বছরে তারা কর্মএলাকাগুলোতে ৯৭টি বাল্য বিবাহ, ৭১টি যৌতুক, ৭টি দ্বিতীয় বিবাহ ও উত্যক্ত করা, ৪২টি হিল-া বিয়ে এবং মৌখিক তালাক প্রতিরোধ করেছেন। এছাড়া ১৮১টি বিয়ে নিবন্ধন এবং ৬৪৭ জন সুযোগবঞ্চিত নারীকে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে বিভিন্ন সহায়তা পেতে সাহায্য করেছেন। ▣

## ‘জনগণের খাদ্যের অধিকার’ শীর্ষক আলোচনা

নাগরিক উদ্যোগ এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব-াস্ট)- এর যৌথ আয়োজনে গত ২০ ডিসেম্বর ২০১০ রাজধানীর ওয়াইডবি-উসিএ মিলনায়তনে ‘জনগণের খাদ্যের অধিকার’– শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশে বিরাজমান খাদ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রম এবং সম্ভাব্য জোট গঠনের প্রস্তাবনা, এ বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর খাদ্যের অধিকার বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপিত হয়। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মনোয়ার মোস্তফা, ব্যারিস্টার সারা হেসেন, সৈয়দ শামসুজ্জামান এবং নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন প্রমুখ। আলোচনা শেষে অনুষ্ঠিত প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি, আইনজীবী এবং গবেষকবৃন্দ স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ করেন। ▣

### বিশ্ব মানবিক মর্যাদা দিবসের কর্মসূচিতে বক্তারা

## দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করতে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে

দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী তাদের প্রতি বিদ্যমান সামাজিক বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা বন্ধ করে মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চিয়তা বিধান করতে সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছে। বিশ্ব মানবিক মর্যাদা দিবস ২০১০ উপলক্ষে গত ৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম) এবং মানবাধিকার সংগঠন নাগরিক উদ্যোগের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও শোভাযাত্রা কর্মসূচিতে বক্তারা এ দাবি জানান।

বিডিইআরএম-এর সভাপতি মুকুল সিকদারের সভাতিত্বে সকাল সাড়ে ১০টায় জাতীয় জাদুঘরের সামনে মানববন্ধন ও শোভাযাত্রা কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সাবেক বিচারপতি গোলাম রাব্বানী।

উদ্বোধনী বক্তব্যে দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এআন্দোলনে সংহতি জানিয়ে গোলাম রাব্বানী বলেন, এ দেশের মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে সবার জন্য সমান ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা একটি স্বাধীন মানচিত্র পেয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা বৈষম্যহীন ও মর্যাদাপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। এখন দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীসহ সবার সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্যহীন সমাজের জন্য আমাদের আরো সংগ্রাম করতে হবে।

সংহতি বক্তব্যে নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন বলেন, মানুষের মর্যাদা বিশেষ করে দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায় থেকে উদ্যোগ নিতে হবে।

বিডিইআরএম-এর সভাপতি মুকুল সিকদার বলেন, সবার জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু সে স্বপ্ন আজো বাস্তবায়ন হয়নি। আমরা দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রায় ৫৫ লাখ মানুষ পদে পদে বৈষম্য-বঞ্চনার এবং অস্পৃশ্যতার শিকার।

এছাড়াও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, সাধারণ সম্পাদক বোধানকি শলোমন, দলিত নারী ফোরামের সভাপতি মনি রানী দাস, নাগরিক উদ্যোগের প্রকল্প কর্মকর্তা আবুল বাসার ও বাংলাদেশ দলিত হিউম্যান রাইটস (বিডিএইচআর)-এর সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনি দাস প্রমুখ। ▣

## হিউম্যান রাইটস স্ট্যাডি সেশন ২০১০

নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং এশিয়ান ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান রাইটস (এআইএইচআর) ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে গত ৩০ অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বর ২০১০ সোনারগাঁয়ের বেইস ট্রেনিং সেন্টারে 'এ্যানুয়াল হিউম্যান রাইটস স্ট্যাডি সেশন' শিরোনামে একটি মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ স্ট্যাডি সেশনে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার প্রতিনিধি এবং

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ ২৬জন অংশগ্রহণ করেন। ১৩ দিনব্যাপী পরিচালিত এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মানবাধিকার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, ইতিহাস, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক ঘোষণা, সনদগুলো এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা বিষয়ে আলোচনা হয়। একজন মানবাধিকার কর্মী তার কর্মকাণ্ডে মানবাধিকার বিষয়টি বিবেচনার রেখে কীভাবে কাজ করবেন তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। স্ট্যাডি সেশনটিতে সহায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এডভোকেট সুলতানা কামাল, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, ড. মাহবুবা নাসরিন, এডভোকেট ফৌজিয়া করিম, জাকির হোসেন, অধ্যাপক আমেনা মহসিন, সঞ্জীব দ্রং, ফস্টিনা পেরাইরা, সানাইয়া ফাহিম আনসারী, মনোয়ার মোস্তফা, আলতাফ পারভেজ, জাহেদুর রহমান প্রমুখ। সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন কল্পলতা দত্ত ও জহিরুল ইসলাম। ▣

# ‘Women’s Leadership as a Poverty Reduction Strategy: Lessons from Bangladesh’- শীর্ষক গবেষণাপত্র উপস্থাপন

গত ৩১ আগস্ট ২০১০ ওয়াইডবি-উসিএ মিলনায়তনে নাগরিক উদ্যোগ ও ভিএসও-বাংলাদেশের যৌথ আয়োজনে ‘Women’s Leadership as a Poverty Reduction Strategy : Lessons from Bangladesh’ শীর্ষক গবেষণার ফল উপস্থাপন করেন কুইন্স ইউনিভার্সিটির পিএইচডি ছাত্র রায়ান হিগিট। মি. হিগিট ২০০৮ সালে স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা নাগরিক উদ্যোগের সাথে ৯ মাস যুক্ত থেকে এ গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা যারা নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী নেতৃত্ব বিকাশে কাজ করেন, তাদের কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন এবং এ বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন।

উক্ত আয়োজনের সভাপ্রধান আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক এডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন, মি. হিগিট গবেষণায় নারী নেতৃত্ব এবং সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে সত্যিকারের সংযোগটি কি তা বিশে-ষণ করে দেখিয়েছেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য আরমা দত্ত বলেন, গবেষণাটি বর্তমান সময়ের জন্য সময় উপযোগী।

জাতীয় তথ্য কমিশনের সদস্য ড. সাদেকা হালিম বলেন, মি. রায়ানের গবেষণায় সমাজে বিদ্যমান সনাতনী ধ্যান-ধারণাগুলো চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরিন বলেন, এগবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে নারীদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে হলে তাদের ভেতর বিশ্বাস, সাহস, আস্থা বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদনশীল ক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে নারীনেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন বলেন, এ গবেষণা উন্নত সমাজ ব্যবস্থা তৈরিতে কী ধরনের নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী এবং উন্নয়কর্মীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ◻

# ‘স্থানীয় পর্যায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সালিশী পরিষদের করণীয়’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০- এ নাগরিক উদ্যোগের আয়োজনে রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলা মিলনায়তন এবং ৫ ডিসেম্বর মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলা মিলনায়তনে ‘স্থানীয় পর্যায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সালিশী পরিষদের করণীয়’ শীর্ষক দুটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। গঙ্গাচড়া উপজেলা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে গঙ্গাচড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মজিবর রহমান প্রামাণিক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহাবুবুল হক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীনগর উপজেলা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপজেলা চেয়ারম্যান বেলায়েত হোসেন ঢালী, নির্বাহী কর্মকর্তা আঃ লতিফ মোল-া এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা রহিমা বেগম উপস্থিত ছিলেন। সেমিনার দুটিতে মোট ১৮৬ জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে নারী ৪৩ জন এবং পুরুষ ১৪৩ জন।

গঙ্গাচড়ায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে ৯টি ইউনিয়ন এবং শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত সেমিনারে ১৪টি ইউনিয়ন থেকে চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, নাগরিক উদ্যোগের বিভিন্ন কমিটির সদস্য, কাজি, ইমাম, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে সালিশী পরিষদের এখতিয়ারধীন তালাক, ভরণপোষণ ও বহু বিয়ে সম্পর্কে সালিশী পরিষদের করণীয়, ন্যায়বিচার ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়। সেমিনার দুটিতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নাগরিক উদ্যোগের সিনিয়র কর্মসূচি কর্মকর্তা অমিত রঞ্জন দে।

প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তরা বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে যদি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে সমগ্র দেশেই তার সুফল পাওয়া যাবে। এ জন্য প্রয়োজন জনসাধারণকে আইনের বিষয়ে সচেতন করা এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী ও সক্ষম করে গড়ে তোলা। বক্তরা বলেন, সমাজ থেকে যদি বাল্য বিয়ে, মাদক, ইভ টিজিং রোধ করা সম্ভব হয় তাহলে অনেক সমস্যার অবসান হবে। ইউনিয়ন পরিষদের সালিশী পরিষদকে আরো কার্যকর করার মাধ্যমে তালাক, ভরণপোষণ ও বহু বিয়ে অভিযোগের মীমাংসা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। ◻

## আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১০ উপলক্ষে

# দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা ও সপ্তাহব্যাপী প্রচারাভিযান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে দুই দিনব্যাপী দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা এবং সপ্তাহব্যাপী প্রচারাভিযান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

গত ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর ২০১০ মোহাম্মদপুরের সিবিসিবি মিলনায়তনে নাগরিক উদ্যোগ, তথ্য অধিকার আন্দোলন এবং কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনেশিয়েটিভ (সিএইচআরআই) সম্মিলিতভাবে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক দুই দিনব্যাপী এ কর্মশালা আয়োজন করে।

কর্মশালার উদ্বোধন করেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ-এর প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমির। কর্মশালার বিভিন্ন অধিবেশনে সহায়ক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার, আর্টিকেল-১৯ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর তাহমিনা রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাবেরী গায়েন, ভারতের সিএইচআরআই-এর সিনিয়র কর্মসূচি কর্মকর্তা সোহিনী পাল, ভারতের কলকাতা ভিত্তিক সংগঠন ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন এন্ড সার্ভিসেস সেন্টার- এর সমন্বয়কারী সুব্রত কুণ্ডু, নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী এবং তথ্য অধিকার আন্দোলনের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, তথ্য অধিকার আন্দোলনের সমন্বয়কারী অমিত রঞ্জন দে, নাগরিক উদ্যোগের প্রকল্প কর্মকর্তা হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, সহকারি প্রকল্প কর্মকর্তা ইকরাম হোসেন প্রমুখ। দুই দিনব্যাপী একর্মশালায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, এনজিও প্রতিনিধি এবং তথ্য অধিকার আন্দোলনের কর্মীসহ ৫১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা, এ আইন বাস্তবায়নে বাধা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা, তথ্য অধিকার আইন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বোঝা এবং জনগণের স্বার্থে এআইনকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দক্ষতা তৈরি, আইন বাস্তবায়নে বাধা ও চ্যালেঞ্জগুলোর সম্ভাব্য সমাধান নির্ণয় করা এবং আইন বাস্তবায়নের জন্য অ্যাডভোকেসি কৌশল চিহ্নিত করা। কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম।

২৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় সপ্তাহব্যাপী সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান কর্মসূচির। এদিন সকাল সাড়ে ১০টায় বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শুরু হয়।

তথ্য অধিকার আন্দোলন ও নাগরিক উদ্যোগ যৌথভাবে আয়োজিত এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ- এর তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম। তথ্য অধিকার আন্দোলন এর সদস্য সচিব ও নাগরিক উদ্যোগ- এর প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংহতি বক্তব্য রাখেন যুব নাগরিক অধিকার জোটের ইকরাম হোসেন, গ্রিন ভয়েসের আলমগীর কবির, মানবাধিকার নাট্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোতাহার আকন্দ, নাট্যাভিনেতা রাশেদ মামুন অপুসহ নাগরিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।

এতে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় জনসাধারণ তথ্য অধিকারের ওপর নির্মিত পথনাটক, গান ও আলোচনা উপভোগ করেন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। প্রচারাভিযান কর্মসূচিতে দশ হাজার লিফলেট, তথ্য অধিকার আইনের বই ও তথ্য চাওয়ার নির্ধারিত আবেদন ফরম বিতরণ এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ঘোষণা ও সচেতনতামূলক গান প্রচার করা হয়।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ দুপুর সাড়ে ৩ টায় নগরীর মুক্তাঙ্গনে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তথ্য অধিকার আন্দোলনের সদস্য সচিব জাকির হোসেন ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রুহিন হোসেন প্রিন্স। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তথ্য অধিকার আন্দোলনের সমন্বয়কারী অমিত রঞ্জন দে। সমাপনী অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতামূলক পথ নাটক 'কানামাছি' পরিবেশিত হয়। ▣

# জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের সম্পাদিত কিছু কার্যক্রম

জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গত জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০ সম্পাদিত কার্যক্রমগুলোর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তুলে ধরা হলো–

### উপজেলা প্রকল্প পরিচিতি সভা

কর্মএলাকার উপজেলা পর্যায়ে ৫টি প্রকল্প পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। এছাড়া সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সচিবসহ উপজেলার শিক্ষক, স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ ২৮৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

উপজেলা পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সামনে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরাই ছিল এ পরিচিতি সভার মূল উদ্দেশ্য।

### ইউনিয়ন প্রকল্প পরিচিতি সভা

প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩৪টি প্রকল্প পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সব নির্বাচিত সদস্যসহ ইউপি সচিব এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ ৬৪৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভার মাধ্যমে মানবাধিকার সংস্থা হিসাবে নাগরিক উদ্যোগ'- এর কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরা এবং বাস্তবায়িত প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা এবং কর্ম এলাকার মানুষের সাথে পরিচিতি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

### সাংগঠনিক উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নাগরিক অধিকার দলের সাথে কর্মশালা

কর্মএলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে 'সাংগঠনিক উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নাগরিক অধিকার দলের ভূমিকা শীর্ষক' ৩৪টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে কর্মশালায় নাগরিক অধিকার দলের গুরুত্ব ও গঠন কাঠামো, কার্যক্রম ও নাগরিক অধিকার দলের নীতিমালাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ কর্মশালাগুলোতে ৯৪১ জন নারী ও ১৪৫৬ জন পুরুষসহ ২৩৯৭ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। উলে-খ্য, প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে ২ জন (১ জন নারী ১ জন পুরুষ) করে ৯টি ওয়ার্ড থেকে ১৮ সদস্যের নাগরিক অধিকার দল গঠন করা হয়েছে। ◻

## সালিশ কার্যক্রম

জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত নাগরিক উদ্যোগের ৮টি কর্মএলাকার নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে 'সালিশের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার' তথ্য :

| বিষয় | পূর্বে অপেক্ষমান | অভিযোগ গ্রহণ | মোট সংখ্যা | মীমাংসা | বাতিল | মামলা | বর্তমানে অপেক্ষমান |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পারিবারিক নির্যাতন | ১১৭ | ৪৫৮ | ৫৭৫ | ৩৬৭ | ৮৯ | ০৩ | ১১৭ |
| দেনমোহর | ০৯ | ১০ | ১৯ | ০৯ | ০৪ | ০০ | ০৬ |
| ভরণপোষণ | ৪৬ | ৬৪ | ১১০ | ৪১ | ২২ | ০১ | ৪৬ |
| বহু বিবাহ | ০৮ | ০৯ | ১৭ | ০৪ | ০৬ | ০০ | ০৭ |
| তালাক | ১০ | ২২ | ৩২ | ০৯ | ০৬ | ০০ | ১৭ |
| অভিভাবকত্ব দাবি | ০১ | ০৩ | ০৪ | ০১ | ০২ | ০০ | ০১ |
| দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার | ২৪ | ৮৪ | ১০৮ | ৫৫ | ২৬ | ০০ | ২৭ |
| পৃথক বসবাস | ০০ | ০২ | ০২ | ০১ | ০০ | ০০ | ০১ |
| প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ | ১২ | ১৫২ | ১৬৪ | ১৪৭ | ০৮ | ০০ | ০৯ |
| উত্ত্যক্ত করা | ০০ | ০৬ | ০৬ | ০৪ | ০১ | ০০ | ০১ |
| জমি সংক্রান্ত বিরোধ | ২৫ | ৬২ | ৮৭ | ৫৫ | ১৩ | ০০ | ১৯ |
| উত্তরাধিকার | ০৪ | ০৬ | ১০ | ০৩ | ০১ | ০০ | ০৬ |
| ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ে বিরোধ | ০২ | ০৪ | ০৬ | ০৩ | ০২ | ০০ | ০১ |
| ব্যক্তিগত ঋণ বিষয়ে বিরোধ | ১৫ | ৪১ | ৫৬ | ৩৫ | ১৩ | ০০ | ০৮ |
| ক্ষতিপূরণ দাবি | ০৩ | ১৬ | ১৯ | ১৬ | ০১ | ০০ | ০২ |
| চুরি | ০০ | ০৮ | ০৮ | ০৬ | ০১ | ০০ | ০১ |
| অন্যান্য | ১১ | ০৯ | ২০ | ০৮ | ০৪ | ০০ | ০৮ |
| **মোট** | **২৮৭** | **৯৫৬** | **১২৪৩** | **৭৬৪** | **১৯৯** | **০৩** | **২৭৭** |

* নাগরিক উদ্যোগের নিবন্ধনের বাইরে উলি-খিত সময়ে মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দল, ওয়ার্ড সালিশ কমিটি এবং নারীনেত্রীরা স্থানীয়ভাবে ১২১৯ টি বিরোধ সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা করেছেন।

** দেনমোহর, ভরণপোষণ, যৌতুকের অর্থ ফেরত, জমি, ব্যক্তিগত ঋণ ইত্যাদি অভিযোগ মীমাংসা করে উপকারভোগীদের ১৫,৩৩০,২৪৬ টাকা এবং ১০৪ শতক জমি আদায় করে দেয়া হয়েছে।

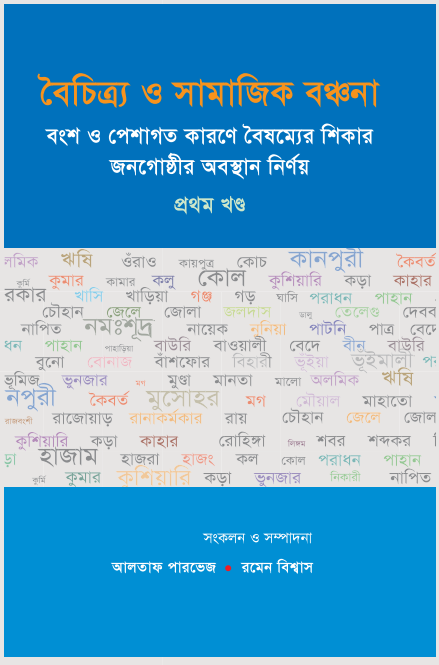


বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকারের স্বীকৃতি থাকলেও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এখনো নানা বৈষম্যের শিকার। এদের মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত হলো দলিত জনগোষ্ঠী। সামগ্রিকভাবে শিক্ষা, সুযোগ ও সম্পত্তিতে অধিকারহীনতার কারণে নিজেদের অধিকার আদায়ে সংঘবদ্ধ হতে পারেনি। বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম) প্রথমবারের মতো এসব বিচ্ছিন্ন বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কাজে নাগরিক উদ্যোগ সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করছে। বিডিইআরএম ‘বৈচিত্র্য ও সামাজিক বঞ্চনা’ শিরোনামে একটি সংকলন প্রকাশ করেছে। এই প্রকাশনায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কিংবা বিভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত দলিতদের ৫৭টি জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

**সংকলন ও সম্পাদনা :** আলতাফ পারভেজ ও রমেন বিশ্বাস

**প্রকাশক :** বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম) এবং নাগরিক উদ্যোগ

**প্রকাশকাল :** আগস্ট ২০১০

**মূল্য :** ১০০ টাকা

ISBN : 978-984-33-1622-6

‘প্রতিবন্ধিত্ব প্রেক্ষিত মানবাধিকার ও সেবার মান উন্নয়ন’ এটি একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ। উক্ত প্রকাশনাটিতে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর বৈশ্বিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশপাশি প্রতিবন্ধিত্বের কারণ নির্ণয়, দেশীয় অবস্থান থেকে তাদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, তাদের প্রতি পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় আচরণ এবং দৃষ্টিভঙিও ফুটে উঠেছে। গবেষণা কাজে আন্তজার্তিকভাবে স্বীকৃত জরিপ পদ্ধতি এবং কেইস স্ট্যাডির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য সন্নিবেশ হয়েছে আলোচিত গ্রন্থটিতে। এছাড়া সংযোজিত হয়েছে বাংলায় প্রকাশিত জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ এবং ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধি-বিধান’। প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছেন বা কাজের আগ্রহ আছে এমন প্রতিষ্ঠান এবং একাডেমিশিয়ানদের জন্য একটি সহায়ক প্রকাশনা।

**গবেষক :** জাকির হোসেন ও ড. আলতাফ হোসেন

**প্রকাশক :** নাগরিক উদ্যোগ

**প্রকাশকাল :** জুন ২০১০

**মূল্য :** ১৫০ টাকা

ISBN : 978-984-33-2058-2

প্রতিনিয়ত আমরা কোনো না কোনোভাবে পুলিশের মুখোমুখী হই। আমরা পুলিশকে অনেক দায়িত্ব পালন করতে দেখি যেমন– যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, ভিআইপিদের নিরাপত্তা, উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে নিয়ন্ত্রণ, জনগণকে নিরাপত্তা দিয়ে আদালতে নেয়া, আদালতে সাক্ষ্য প্রদান, থানায় অভিযোগ দায়ের বা অপরাধী ও জঙ্গিদের পাকড়াও ইত্যাদি। আমরা পুলিশ সম্পর্কে পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন ও জনসাধারণের কাছ থেকে প্রচুর শুনতে পাই। প্রত্যেকেরই পুলিশ সম্পর্কে একটা মতামত থাকে। কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ মানুষই তাদের সম্পর্কে খুব কম জানে।

এ পুস্তিকাটি পুলিশকে জানার একটি সহজ নির্দেশিকা। সাধারণত যখন আমরা কোনো বিষয়ে জানি তখন তা বলিষ্ঠভাবে বলতে পারি এবং যখনই আমরা নির্ভয়ে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলি তখন তার ইতিবাচক পরিবর্তন হয়। পুস্তিকাটি এই প্রত্যাশায় প্রকাশ করা হলো যে, পুলিশ ও জনগণের অধিকার সম্পর্কে জেনে প্রত্যাশিত উন্নত পুলিশি সেবার লক্ষ্যে তাদের লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাবে।

**অনুবাদ ও প্রাসঙ্গিকীকরণ :** এডভোকেট তাজুল ইসলাম ও মাজহারুল ইসলাম

**পর্যালোচনা :** সারা হোসেন ও জাকির হোসেন

**অঙ্কন :** রাজীব বাঙাল ও সৌরি ছোঁয়া

**প্রকাশক :** নাগরিক উদ্যোগ, ব্লাস্ট ও কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ

**দাম :** ১০০ টাকা

ISBN : 978-984-33-1980-7